বিনিময় ১৫ টাকা

অধিকার

অক্টোবর ২০২২

এই সংখ্যার বিষয়

- **নিষিদ্ধকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধে**
- **বঞ্চিতের লড়াই নাকি লড়াইয়ের দিশামুখ**
- **প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য আইন**
- **অনিশ্চিৎ ন্যায়**
- **PUCL প্রেস বিবৃতি**
- **মানবাধিকার সনদ ও ভারতের সংবিধান এবং...**
- **তথ্যানুসন্ধান**
- **সংগঠন সংবাদ**
- **পাঠকের চিঠি**

সম্পাদনা: পত্রিকা উপসমতি। গণতান্ত্রিক অধিকাররক্ষা সমিতির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর (8017437302) কর্তৃক প্রকাশিত ও ভিভিড কম্পিউটার, রিষড়া থেকে মুদ্রিত।

E-mail : apdr.wb@gmail.com
Website : www.apdrwb.in

অধিকারের জন্যে লেখা, মতামত পাঠান
apdr.adhikar@gmail.com

নিষিদ্ধকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধে

কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি পপুলার ফ্রন্ট ইন্ডিয়া (PFI), NCHRO, Campus Front of India সহ ৯ টি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই ৯ টি সংগঠন ছাড়াও এদেশে এই মুহূর্তে আরও শতাধিক সংগঠন নিষিদ্ধ আছে। এই সংগঠনগুলির মধ্যে রয়েছে সিপিআই (মাওবাদী) ও তাদের প্রভাবিত বিভিন্ন গণসংগঠন। রয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন জাতিসত্তার সংগঠন। ভারত সরকার কর্তৃক মুসলিম সন্ত্রাসবাদী বলে ঘোষিত বিভিন্ন সংগঠনকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। লক্ষনীয় নিষিদ্ধ সংগঠনগুলির মধ্যে রয়েছে কয়েকটি ছাত্র সংগঠনও। যেমন ছাত্র সংগঠন সিমি, আরএসএ, ক্যাম্পাস ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া প্রভৃতি। সাংস্কৃতিক সংগঠন, মহিলা সংগঠন কিছুই বাদ যায়নি। অতীতে আরএসএসকেও তিনবার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। নিষিদ্ধ করা হয়েছিল অবিভক্ত ভারতের কমুনিষ্ট পার্টি অর্থাৎ সিপিআইকে, অবিভক্ত সিপি আই (এম এল), এমসিসি- কেও। আমাদের সংগঠন এপিডিআর ও জরুরী অবস্থার সময় রাজরোষে পড়ে এবং নিষিদ্ধ হয়। অতীতে কয়েকটা শ্রমিক সংগঠনও নিষিদ্ধ হয়েছে। যেমন দুর্গাপুরের পিএল আই, অন্ধ্রপ্রদেশের সিংগারিনী কোল মাইনসের শ্রমিক সংগঠন। কয়েকবছর আগে ঝাড়খন্ড- বিহারের একটি শ্রমিক সংগঠন এমএসএস ও নিষিদ্ধ হয়। বিহারের কৃষক সংগঠন এমকেএসএস কেও নিষিদ্ধ করা হয়। লক্ষনীয় কেন্দ্রে বা বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দল ক্ষমতায় থাকলেও অপছন্দের সংগঠন নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে বা কেন্দ্রীয় সরকার নিষিদ্ধ করার পর দমন পীড়নে কেউই পিছিয়ে পড়েনি। নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার বা নাগরিক অধিকার বা মানবাধিকার নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন এমন সকলের কাছেই বিষয়টি ভাবনার। ঘোষিতভাবে একটি গণতান্ত্রিক রাস্ট্র , পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাস্ট্র, কেন ভিন্ন মত ও পথের কোন সংগঠনকে নিষিদ্ধ করবে? বই, পত্রপত্রিকাকে নিষিদ্ধ করবে?

কেন হাজারো চিন্তার দ্বন্দ্বকে বিকশিত হতে দেওয়া হবে না? সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে সেটাই তো স্বাভাবিক, লাভজনক এবং কাম্য। নিষিদ্ধ করে সত্যিই কী কোন মতাদর্শকে আটকে রাখা যায়? নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে শেষ বিচারে লাভ হয় কি রাস্ট্রের?

উল্লেখ্য, প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধকরণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে দানবীয় ইউএপিএ আইনকে। আমরা মনে করি অসাংবিধানিক এই আইনকে অবিলম্বে বাতিল করা উচিত।

গণতন্ত্রের স্বার্থে নিষিদ্ধকরণের এই রাজনীতিকে খতিয়ে দেখা আজ খুব জরুরি। আমরা মনে করি কোন সংগঠনকেই নিষিদ্ধ করা উচিত নয়। নিষিদ্ধ করা উচিত নয় কোন বই বা পত্রপত্রিকাকেও। কোন সংগঠনের মত ও পথকে ভুল মনে করলে তার সাথে মতাদর্শগত বিতর্ক চালাতে হবে। নিষিদ্ধ ঘোষনা করে দমনপীড়ন নামিয়ে জেলে পুরে তাকে ধ্বংস করার চেস্টা করা কোন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। এর থেকে বিরত থাকতে হবে।

বঞ্চিতের লড়াই নাকি লড়াইয়ের দিশামুখ

শাহানারা খাতুন।

লাগাতার আন্দোলনের ইতিহাসে এক অনন্য নজির ২০১৬ এর SLST নবম- দ্বাদশ শিক্ষক পদ প্রার্থীদের আন্দোলন। এই আন্দোলন, এই অবস্থান আন্দোলন ৬০০ দিন অতিক্রম করে গেছে। এই লেখা যখন ছাপা হয়ে বের হবে আরো ২০ দিন অতিক্রম করে যাবে। ৬০০ তম দিনে এই আন্দোলনের নতুন নামকরণ হয়েছে ' বঙ্গীয় ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা মঞ্চ'। শীত,গ্রীষ্ম,বর্ষা মাথায় নিয়ে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কে উপেক্ষা করে কলকাতার ব্যস্ততম রাস্তার ধারে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে তাঁদের অবস্থান আন্দোলন চলছে। শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় পাশ করেও তাঁরা নিয়োগ পত্র পাননি। শিক্ষক নিয়োগে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি। এই দুর্নীতিতে কে জড়িত আর কে নয় খুঁজতে গেলে খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজার মতো গোটা শিক্ষা দপ্তর , মন্ত্রীসভা,শাসক ঘনিষ্ঠ নেতা আমলা সবাই জড়িয়ে যাবে। মানে জড়িয়ে গেছেও। জেলে রয়েছেন শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী, আমলা, সচিব। এই দুর্নীতিকে ধামা চাপা দিতে সরকার লেলিয়ে দিয়েছে প্রশাসনকে। ঝড় -বৃষ্টির রাতে তাঁদের মাথার আচ্ছাদন কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কেটে দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ। সরকারি সুলভ শৌচালয় ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি। পূজা কার্নিভালের নামে সরকারি টাকার মোচ্ছবে যাতে দেশবিদেশের অতিথিদের সামনে সরকারের মুখ না পোড়ে, তাই সাদা কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে অবস্থান আন্দোলনের মঞ্চ। শাসক ঘনিষ্ঠ কিছু চাকরি প্রার্থীকে টোপ দিয়ে ঢুকিয়ে আন্দোলনের গতিপথ বদলে দিতে চেয়েছে। তবুও আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। তাঁদের এই আন্দোলন স্বচ্ছ নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন। শিক্ষিত যুবক- যুবতী দের একটা বড়ো ভরসার জায়গা ছিল SSC। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ছিল। মেরিট লিস্ট দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতো । ডি এম অফিসেও টাঙানো থাকত। ইন্টারভিউ লেটার এবং রেকমেন্ডেড লেটার আসত বাই পোস্টে। পরে বদলে গেল। সব কিছু অনলাইন হয়ে গেল। ঘন ঘন মেরিট লিস্ট বদলে যেতে লাগল। বদলে গেল চিঠি পাঠানোর নিয়ম। চিঠি ডাউনলোড করে নিতে হলো প্রার্থীকে। ঢুকে গেল গোঁজা মিল। কে আগে,কে পরে, কখন কোন লিস্ট ধরে কাকে ডাকা হচ্ছে রীতিমতো তদন্ত সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে গেল।

শুধু কি তাই গ্রান্ট ও সুবিধা পাওয়ার নাম করে,সরকারি কর্মচারীদের মতো শিক্ষক- শিক্ষিকারাও সুযোগ পাবেন এই যুক্তি দেখিয়ে স্কুল গুলোকে গভর্নমেন্ট এডেড থেকে গভর্নমেন্ট স্পনসর করা হলো। স্কুল গুলো সরাসরি সরকারি সম্পত্তি হয়ে গেল। স্কুল পরিচালন কমিটি নির্বাচন বন্ধ হয়ে গেল। এলো শাসক মনোনীত সভাপতি। যাঁর প্রত্যক্ষ/ পরোক্ষ প্রভাবে চলছে স্কুল। বাতিল হয়ে গেছে পর্ষদ নির্বাচন। পর্ষদ প্রতিনিধিও শাসক দলের মনোনীত। তাই শিক্ষার সর্বস্তরে অবাধ দুর্নীতি।

২০০৯ এবং ২০১৪ এর প্রাইমারী টেট উত্তীর্ণ নন- ইনক্লুডেড প্রার্থীরাও টানা আন্দোলন করে আসছে। ২০১৪ এর প্রার্থীরা সল্টলেকের করুণাময়ীর রাস্তায় টানা চারদিন অনশন অবস্থান করে। একরোখা আন্দোলনের ইতিহাসে এও এক নজির। রাতের অন্ধকারে কোনো এক অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে আন্দোলন কারীদের পুলিশ টেনে হিঁচড়ে তুলে দেয়। পুলিশের হিংস্র আক্রমণ থেকে মহিলা আন্দোলনকারী রাও রেহাই পায় না। স্বচ্ছ এবং দ্রুত নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন কারীরা এক্সাইড মোড় অবরোধ করে। অবরোধ কারীদের পুলিশ হঠানোর চেষ্টা করলে আন্দোলন কারীরা এক জায়গা থেকে সরে আরেক জায়গায় বসে। আন্দোলন কারীদের পুলিশ টেনে হিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তুললে চাকরি প্রার্থীরা বাসের চাকার নিচে শুয়ে পড়ে– হয় চাকরি নয় মৃত্যু এই তাঁদের দাবি। এক মহিলা আন্দোলনকারীর হাতে এক মহিলা পুলিশ কর্মী কামড়ে পর্যন্ত দেয়। সব মিলিয়ে এক রক্তাক্ত ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

কেন হলো এ অবস্থা? কেন বারবার পথে নামতে হচ্ছে বাংলার চাকরি প্রার্থী যুবসমাজকে ? কোথায় গেল চাকরি গুলো? গ্রামাঞ্চলের স্কুল গুলো শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে। একের পর এক গজিয়ে উঠছে বেসরকারি স্কুল। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন ২০২১ এ যে ২০০০০ জন এর ইন্টারভিউ হয়েছে তার মধ্যে ১৬০০০ জন কে নিয়োগ করা হয়েছে। RTI রিপোর্ট বলছে ১২০০০ জন নিয়োগ পত্র পেয়েছে। এখনো ৭৫০০ পদ শূন্য। এই পদে স্বচ্ছ নিয়োগ হোক। ইতিমধ্যেই যারা নিয়োগ পেয়েছে আর যাদের নিয়োগ করা হবে স্কোর সীটের ব্রেক আপ সহ বিস্তারিত প্যানেল জনসমক্ষে আনা হোক। আদৌ কী তা হবে? যে রাজ্য দুর্নীতিতে নাক পর্যন্ত ডুবিয়ে ফেলেছে সেখানে স্বচ্ছতা দুরাশা। তবুও আশার আলো আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা ঝড়-বৃষ্টি- বাদল উপেক্ষা করে রাজপথে রাত জাগছে। অমানিশা একদিন কাটবেই।

প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য আইন – অধিকার হননের আর এক খসড়া

নিশা বিশ্বাস

আড়াই বছর ধরে অতিমারীর নামে জনজীবন স্তব্ধ করে আমরা যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম তা কল্পনাতীত। তালি ও থালি বাজিয়ে, জনতার কার্ফু নামে যে খেলা শুরু হল তার পরিণতি চিকিৎসার রেজিমেন্টেশন। চিকিৎসার নামে নিত্য নতুন প্রোটোকল। চিকিৎসায় ঢুকলো যুদ্ধের ভাষা যার প্রথম বলি হলো 'সত্য' আর আক্রমণ হলো জনগণের উপরে। যুদ্ধের পরিভাষায় অপ্রয়োজনীয় এবং অন্যায় মৃত্যুকে বলা হলো 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ'। অতিমারীর উৎস, তার ব্যাপকতা, মারণ ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন করলে হবে দেশদ্রোহী। উপসর্গহীন লোকেদের উপর সন্দেহবশতঃ জোর জুলুম, মুখোশের যৌক্তিকতা, অপরীক্ষিত ভ্যাকসিনের ক্ষতিকর দিক নিয়ে প্রশ্ন করা যেন দেশদ্রোহ ! চললো ডি এম আইনে অমানবিক দমন পীড়ন !

প্রশ্ন করা গেলো না যে কাদের পরামর্শে ৪ ঘন্টার নোটিশে লকডাউন করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হাজার হাজার কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হাঁটতে বাধ্য করা হল। রাস্তায় ঘটা হাজারেরও বেশী মৃত্যুর দায় কার। কোটি কোটি মানুষের রোজগার কেড়ে কেন তাদের ফ্রী ৫ কিলো চাল, ২ কিলো গম/ আটা, ৫০০ গ্রাম ডাল ও অল্প তেলের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়াতে বাধ্য করা হলো। আজ, আড়াই বছর পরেও সরকার সদর্পে, সগর্বে জানাচ্ছে যে তারা দেশের ৮০ কোটি মানুষকে এই ফ্রী রেশন দিছে। শাসকদলের ডাকসাই নেতাদের ছবি ঐ রেশনের প্যাকেটে ছাপা হচ্ছে। যেন তাদের পয়সায় এই রেশনের জিনিসপত্র কিনে দেওয়া হচ্ছে। দেশের প্রায় ৬০ শতাংশ জনসংখ্যাকে বেঁচে থাকার জন্য ফ্রী রেশনের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়েছে বিগত আড়াই বছর ধরে। তা কি করে অত্যন্ত লজ্জার না হয়ে গর্বের কারণ হতে পারে নেতা – মন্ত্রী – সন্ত্রীরাই বলতে পারবে। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে তা বোঝা অসম্ভব।

মানুষের অধিকার হরণের জন্য আইনের ব্যবহার তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো দক্ষতার শিখরে নিয়ে গিয়েছে গত আট বছরের কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। মাত্র ৪ ঘন্টার নোটিশে ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল করে আমাদের দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ব্যাঙ্ক ও এটিএমের সামনে ঘন্টা পর ঘন্টা লাইনে দাঁড় করিয়ে, লকডাউনের নামে রোজগার কেড়ে ঘরে ঢুকিয়ে, মাইলের পর মাইল রাস্তা হাঁটিয়ে তারা যাচাই করে নিয়েছে সরকারের প্রতি আমাদের আনুগত্য। আমরা সরকারের প্রতি আস্থার পরীক্ষায় একশোয়ে একশো পেয়েছি। আর দুএক জন ব্যতিক্রমীদের দেশের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে নির্মুলীকরণের ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছে। তাদের তকমা দেওয়া হয়েছে মাওবাদী, শহুরে নাকশাল কিংবা অধুনা কলমধারী নাকশাল।

আড়াই বছর ধরে অতিমারীর নামে লাভ কার হল? লাভ হয়েছে প্রাইভেট হাসপাতালের গলাকাটা চিকিৎসা বিল দিয়ে, প্যাথোলজি ল্যাবের চড়া দামে অবৈজ্ঞানিক 'আর টি পি সি আর' (rtpcr) টেষ্ট করিয়ে, ওষুধ ও ভ্যাকসিন নির্মাতা কোম্পানির আর তাদের পরিচালিত ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশনের টাকায় পুষ্ট 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার' অথবা 'হু' (WHO) এর এবং স্বাস্থ্যবীমা কোম্পানিগুলোর যারা সুযোগ বুঝে সরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থায়ও ঢুকে পড়ে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীন 'হু' নামের সংস্থা একটি বানিজ্যিক সংস্থা যার সর্বোচ্চ পুঁজি আসে বিল অ্যান্ড মিলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন ও গাভী (Global Alliance for Vaccines and Immunization) থেকে। সব থেকে বড় পাওনা হল জনমানসে ভয়ের সঞ্চার। সব জেনেবুঝেও আজও 'ভ্যাক্সিন নিয়ে নি, কি বলো?'

আর এই ভয়কে কাজে লাগিয়ে, সংক্রামক রোগের ভয় দেখিয়ে, জনস্বাস্থ্যের নামে আনা হচ্ছে স্বাস্থ্য আইন ২০২২ যার প্রস্তুতি চলছে ২০১৭ সাল থেকে। কোভিড প্যানডেমিকের আতঙ্ক ছড়ানোর আগে ২০১৭ সালে ভারত সরকার একটি আইনের কথা ভেবে ছিল যার পোশাকি নাম 'দ্য পাবলিক হেলথ (প্রিভেনশন, কনট্রোল অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ এপিডেমিকস, বায়ো টেররিজম অ্যান্ড ডিজাস্টার) বিল ২০১৭' (The Public Health (Prevention, Control and Management of Epidemic, Bioterrorism and Disaster) Bill 2017)। ক্যাবিনেটে প্রস্তুত করা এই বিলে জনস্বাস্থ্য ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। স্বাস্থ্যবিল দেখে মনে হবে যেন দেশ জনস্বাস্থ্যের সমস্ত প্যারামিটারে সাফল্য লাভ করে এবার অতিমারির দিকে মনোনিবেশ করছে!

প্রথমত, জনস্বাস্থ্য বলতে আমরা কি বুঝি? শুধু অতিমারী, জৈব সন্ত্রাস এবং বিপের্যয় মোকাবিলা নয় সুস্থ ও রোগমুক্ত জীবনের জন্য যথাসময় সাশ্রয়ী স্বাস্থ্য পরিশেবার সাথে সাথে পুষ্টিকর খাবার, পরিশ্রুত জল এবং পরিচ্ছন্ন বাসস্থান ও নিকাশি ব্যবস্থার অভাবকে পুরণ করাই জনস্বাস্থ্য নীতির প্রাথমিক লক্ষ্য যা এই নীতিতে পুরোপুরি অবর্তমান। তাহলে কি দেশের মানুষ সুস্থ ও রোগমুক্ত জীবন যাপন করছে নাকি অন্য কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে কোভিড প্যানডেমিকের ৩বছর আগে এই বিল তৈরী করার। বিলটি আইন হয়েই যেতো যদি না কিছু রাজ্য সরকার বিরোধিতা করতো অথবা বিজেপি রাজ্যসভায় সংখ্যা গরিষ্ঠ হত।

দ্বিতীয়ত, কেন ২০১৭ থেকে এইরকম আইনের দরকার পড়ল ? প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ২০০৩ সালে যেতে হবে

যখন সার্স কোভ ১ সংক্রমণের জিগির তুলে ২০০৫ সালে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিধি (International Health Regulation 2005) বদল করে বলা হলো যে সম্পুর্ণ অজানা কোনো জীবাণু সংক্রমণকে আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্যের মহাবিপদ (Public Health Emergency of International Concern) বলে এককভাবে ঘোষণা করার ক্ষমতা 'হু' এর মহানির্দেশকে দেওয়া হয়েছে।ফলে ২০০৯ সালে 'হু' 'এইচ ওয়ান এন ওয়ান' (H1N1)কে কেন্দ্র করে মিথ্যা অতিমারী ঘোষণা করার জন্য অতিমারীর সংজ্ঞাকে গোপনে বদল করে 'বিপুল সংখ্যায় মৃত্যু' শব্দবন্ধটিকে ছেঁটে ফেলে দিলো।এই ক্ষমতার ব্যবহার করে 'হু' এর মহানির্দেশক তেদ্রস কোনো যুক্তি ও তথ্যের তোয়াক্কা না করেই কোভিড ১৯ কে আন্তর্জাতিক মহাবিপদ হিসাবে ঘোষণা করলেন।

একটি বাণিজ্যিক সংস্থা চাইবে বেশী বেশী মুনাফা এবং 'হু' এর মত লাভজনক বাণিজ্যিক সংস্থা কমই আছে। 'হু' তে ১ ডলার বিনিয়োগ করলে বছরে ৩৫ ডলার ফেরত আসবে বলে দাবী করেছেন তেদ্রস। কিন্তু এই পহাড়প্রমাণ মুনাফা আসবে কি করে? সরল উপায় - মানুষকে রোগে সন্ত্রস্ত করে বেশী বেশী ওষুধ ও ভ্যাক্সিন বিক্রী করা। তারই জন্য ২০১৭ সাল থেকে 'হু' এর প্রধান হয়ে রয়েছে তেদ্রস আধানম ঘেব্রেইসাস। A Healthy Return: Investment case for a sustainable financed WHO বইয়ের মুখবন্ধে তেদ্রস লিখছেন "বিশ্বস্বাস্থ্য পরিকাঠামোর কেন্দ্র হিসাবে পৃথিবীর এখন প্রয়োজন শক্তিশালী ক্ষমতাবান এবং ধারাবাহিকভাবে অর্থপুষ্ট 'হু'। এই লক্ষ্যের অনুসারী পরিকাঠামো, পদ্ধতি এবং অনুকুল পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে, গত পাঁচ বছর ধরে, সুদূরপ্রসারী সংস্কারের মধ্য দিয়ে 'হু' কে আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে।"

তাই নিপুণভাবে নাটকীয় মৃত্যুর সংখ্যা রচনা করে ত্রাসের আবহ তৈরী করে চাপানো হল পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম লকডাউন। ২০২০ তে আমাদের দেশে ৫৫ নতুন বিলিয়নিয়ার জন্মেছে। যারা আগে থেকেই বিলিয়নিয়ার ছিলেন তাদের সম্পত্তিও বেড়েছে ৩৫%। অন্য দিকে কোটি কোটি মানুষ জীবিকা হারিয়েছেন। ছোটো মাঝারি ব্যবসাগুলি বিধ্বস্ত হয়েছে। রমরমিয়ে বেড়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যাবসা। 'অক্সফাম' এর রিপোর্টে বলা হয়েছে যে প্যানডেমিকের চরম অবস্থায় গড়ে মৃত্যু ছিল দিনে ১০ হজার, সেখানে লকডাউনে জন্য কেবলমাত্র একই বছরে ডিসেম্বর মাসে অনাহারে ১২ হজারেরও বেশী মারা গেছেন প্রতিদিনে।

সরকার কি মানুষের দিকে তাকায়? অবশ্যই! তাদের ভোট লাগে কিন্তু চেয়ার রাখার জন্য ইলেকশনে লাগে বিজয় এবং তার জন্য লাগে টাকা যা দেবে আধুনিক গৌরী সেন মানে কর্পোরেট। এরই জন্য কর্পোরেটের চাই বেশী বেশী মুনাফা। অতিমারীর জিগিরের পক্ষে সরকারগুলিও কারণ মানুষকে ঘরে বন্ধ করে ভয় দেখিয়ে দেশের সরকার ২০২১ এ বর্ষাকালীন ও শীতকালীন অধিবেশনে যথাক্রমে ২৩ এবং ২৬টি আইন পাশ করিয়ে নিলো। পাশ হলো শ্রমিক বিরোধী শ্রম আইন, কৃষক বিরোধী কৃষি আইন, ছাত্র বিরোধী শিক্ষা নীতি, পরিবেশ পরিপন্থী পরিবেশ আইন। বেসরকারিকরণ হলো জীবনবীমা, ব্যাঙ্ক আর রেলের মত জরুরী পরিষেবার। প্রশ্ন করা গেলো না যে জনগণের কষ্টের টাকা ও শ্রম দিয়ে তৈরী এই সংস্থানগুলি বিক্রি করার অধিকার সরকার বাহাদুর পেলো কি করে? তার কাজ তো রক্ষণা-বেক্ষণের ছিল, তা ব্যর্থ হল কেন? জনতার স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কর্পোরেটের হাতে আরও ক্ষমতা, আরও বাজার, আরও সম্পদ এলো কি করে যার ফলে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্রছাত্রী, কর্মচারী এবং সাধারণ নাগরিক হারালো তাদের অধিকার। বিরোধ করার পথ বন্ধ। চুপ D M Act চালু আছে। ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ও নিরাপত্তাহীনতার সুযোগ নিয়ে সহজেই চলে এল অগ্নিপথ প্রকল্প।

আগেই বলা হয়েছে যে কি ভাবে H1N1 ফ্লুকে অতিমারী ঘোষণা করবে বলে অতিমারীর সংজ্ঞা পাল্টে দেওয়া হলো। ২০১৫ সালের মার্চ মাসে বিখ্যাত / অখ্যাত TED Talk দিলেন মাইক্রোসফটের কর্ণধার বিল গেটস। বিষয় ছিল 'পৃথবীর আগামী মহামারী' যাতে তিনি লগ্নীকারীদের আগামী দিনে যুদ্ধাস্ত্রে লগ্নী না করে জীবাণু সংক্রমণের বিষয়ে লগ্নী করার পরামর্শ দেন। জানুয়ারী ২০১৭ সালে দাভোসে অনুষ্ঠিত World Economic Forum এ Coalition for Epidemic Preparedness Innovation নামের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা তৈরী হল। প্রতিষ্ঠাতা এবং লগ্নীকারী সদস্য হলেন বিল অ্যান্ড মিলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন, ওয়েলকাম ট্রাষ্ট, ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরম এবং নরওয়ে, জাপান ও জার্মানীর সরকার।ছিল নামীদামী ফার্মা কোম্পানীগুলোও। পরে এতে যোগদান করে ইয়োরোপিয়ান ইউনিয়ন, বৃটেন ও ভারত সরকার। শুরু হল তেদ্রসের নেতৃত্বে বিশ্ব স্বাস্থ্য ব্যবস্থার তুমুল সংস্কার।

আরএসএস পরিচালিত ফ্যাসীবাদী অগণতান্ত্রিক বিজেপির দমনাত্মক হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার কি এত সুন্দর নজরদারির সুযোগ হাতছাড়া করে? স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রালয় ২০১৭ সালে চটপট মহামারী, জৈব সন্ত্রাস বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে তৈরী করে ফেললো জাতীয় জনস্বাস্থ্য বিল - The Public Health (Prevention, Control and Management of Epidemic, Bioterrorism and Disaster) Bill 2017। এই আইন Epidemic Desease Act, 1897 কে প্রতিস্থাপন করবে।

যদিও দেশের সংবিধানে সেইভাবে স্বাস্থ্যের কথা

বলা হয় নি কিন্তু ভাগ ৪ এ রাজ্যের কর্মপদ্ধতির নির্দেশক নীতিসমূহের অনুচ্ছেদ ৩৮, ৩৯(c), ৪১ ও ৪৭ এ জনকল্যাণ প্রোন্নতকরণের জন্য সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে কর্মপদ্ধতি সংক্রান্ত নীতি, অসুস্থতায় সরকারী সাহায্যপ্রাপ্তির অধিকার, খাদ্যপুষ্টির স্তরের ও জীবনধারণের মানের উত্তোলন এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকরণে রাজ্যের প্রধান কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া মৌলিক অধিকারের অনুচ্ছেদ ২১(a) দেশের প্রতিটি নাগরিককে জীবনের অধিকারের অপরিহার্য অংশ হচ্ছে স্বাস্থ্যের অধিকার।

কাজ হবে কি করে? সংবিধান যাই অধিকার দিক না কেন, বাজেটে বরাদ্দ নামমাত্র! যেখানে প্রতি বছরে জনস্বাস্থ্যখাতে জিডিপির ২.১% ব্যয় করা উচিত কোভিড পরিবর্তিত এই বছরেও স্বাস্থের জন্য বরাদ্দ হয়েছে সামান্য ১.3%। দেশে প্রতি ব্যক্তি চিকিৎসাবাবদ অন্তত ৬৬% খরচ নিজের পকেট থেকে করতে বাধ্য হচ্ছে। রাজ্য তার দায়িত্ব থেকে হাত ধুয়ে ফেলেছে। তবুও আনা হচ্ছে জনস্বাস্থ্য আইন। খসড়া তো ২০১৭ তেই তৈরী হয়েছে। জনস্বাস্থ্য আইন প্রণয়নের জন্য কোভিড তো অনুকুল পরিস্থিতি করেছেই তার সাথে আছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু' এর মাতব্বরীতে - নতুন আন্তর্জাতিক স্তরে বাধ্যতামুলক প্যানডেমিক চুক্তি। এই চুক্তির আওতায় আনা হবে 'বিশ্ব ব্যাংক', 'আই এম এফ', 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশন', 'ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন', 'আফ্রিকান ইউনিয়ান', 'আশিয়ান' .....মত আন্তঃরাষ্ট্র সংগঠন গুলিকে। স্বাস্থ্যব্যবস্থার রেজিমেন্টেশন - এক বিশ্ব এক স্বাস্থ্যের দিকে এগোতে হবে। বিনিয়োগ বাড়াতে হবে প্যানডেমিক প্রতিরোধে এবং এই সমস্ত কর্মকান্ডের বিশ্বব্যাপী সমন্বয় কেন্দ্র হিসাবে থাকবে 'হু'।

তারা গড়ে তুলবে, "A stronger health systems information and reporting mechanisms; including a better use of digital technology for data collection and sharing"

আর কি লাগবে একটি ফ্যাসিবাদী অগণতান্ত্রিক দমনাত্মক সরকারের? এত সুন্দর নজরদারির সুযোগ হাতছাড়া করবে কেন? ২০১৭ র প্রস্তাবিত (দ্য পাবলিক হেলথ প্রিভেনশন, কনট্রোল অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ এপিডেমিকস, বায়ো টেররিজম অ্যান্ড ডিজাস্টার) বিলকেই অল্প স্বল্প পরিমার্জিত করে আনা হচ্ছে জাতীয় জনস্বাস্থ্য আইন ২০২২। যদিও আমাদের হাতে ২০২২ এর আইন নেই তবুও তার ভিত্তি ২০১৭ সালের বিল নিয়েই দেখা যাক কি থাকতে পারে এই ভয়াবহ আইনে।

২০১৭ র বিলের —-

ক) ২ নম্বর ধারায় সজ্ঞায়িত করা হয়েছে -

১) জৈব সন্ত্রাস, জনস্বাস্থ্যের মহাবিপদ, সোশাল ডিসটেন্সিং, মহামারী, কোয়ারেন্টাইন, লনডাউন ইত্যাদি শব্দ,

২) যে কোনো নাগরিক ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগতভাবে জৈবসন্ত্রাসের সন্দেহভাজন হিসাবে গন্য হতে পারে,

৩) সামরিক বাহিনীর চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান অন্যান্য স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠান (প্যাথলজি ল্যাব সরকারি ও প্রাইভেট হাসপাতাল) এর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতা,

৪) শুধুমাত্র সন্দেহ বা অনুমানের ভিত্তিতে পঞ্চায়ত অধিকারিক থেকে জেলা কালেক্টার, জেলা মেজিস্ট্রেটের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কোন অঞ্চলের মানুষের যাতাযাত বা যান চলাচল এমনকি পন্য পরিবহনে বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবে,

৫) নির্জীব বস্তু থেকে প্রাণীদেহ এমনকি মানব দেহ পর্যন্ত জীবাণুমুক্ত বা শুদ্ধিকরণের অধিকার ও দেওয়া হবে স্বাস্থ্য আধিকারিকদের।

খ) ৩ নম্বর ধারায় চারটি স্তরে, পঞ্চায়ত থেকে জেলা হয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রের স্বাস্থ্য প্রশাসনের ক্ষমতা বিভাজন করা হয়েছে। এই আইনে বলিয়ান স্বাস্থ্য আধিকারিক

১) আপনার অনুমতি ছাড়াই যে কোনও ব্যক্তিগত পরিসরে ঢুকে অনুসন্ধান করতে পারে এবং যদি অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয় যে এধরণের মহাবিপজ্জনক জীবাণু অথবা সংক্রমণের বিস্তারে আপনার ভুমিকা আছে তাহলে আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা তারা নিতে পারবে,

২) যে কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা পন্য চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারবে,

৩) সন্দেহ বা অনুমানের ভিত্তিতে তাদের যদি মনে হয় যে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠি তালিকাভুক্ত অসুখগুলিতে আক্রান্ত অথবা সংক্রমিত তাহলে তাদের আলাদা করতে পারবে, মেডিকাল ও ল্যাবরেটারির পরীক্ষা - নিরীক্ষা চালাতে পারবে, চিকিৎসা এমন কি ভ্যাকসিন পর্যন্ত দিতে পারবে। আপনার সম্মতি নেওযার প্রয়োজনের কথা নেই এই আইনে।

গ) ৪ এবং ৫ নম্বর ধারায় কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানীয় প্রশাসনের হাতে যে পরিমাণ ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে তাতে ক্ষমতার চুড়ান্ত অপব্যবহার এবং অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টির সম্ভাবনা ভীষণভাবে বিদ্যমান।

১) কেন্দ্রীয় সরকার যদি মনে করে সারাদেশে বা দেশের কোনো অংশে, জনস্বাস্থ্যর কোনো জরুরি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বা হতে পারে, তাহলে সে রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রশাসিত সরকারকে তার নির্দেশ পালন করাতে পারে। রাজ্য সরকার জেলা এবং স্থানীয় প্রশাসনকে অনুরুপ নির্দেশ দিতে পারে।

পঞ্চায়ত থেকে জেলা, যেকোনো প্রশাসনিক ব্যক্তি যিনি এই নির্দেশ পালনে যুক্ত থাকবেন, তাকে সরকারি আধিকারিক হিসাবে আইনি সুরক্ষা দেওয়া হবে (ধারা ৪ক(১))।

২) প্রথমবার আইন ভঙ্গের দায়ে ১০হাজার টাকা জরিমানা করা হবে এবং দ্বিতীয়বারে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে (ধারা ৫(১))।

৩) যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে আইন বঙ্গ করা হয় তাহলে প্রথমবারে ৫০হাজার টাকা জরিমানা করা হবে এবং দ্বিতীয়বারে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হবে এবং ২ বছর পর্যন্ত হাজতবাসের ও বিধান আছে (ধারা ৫(২))।

৪) রাজ্য স্থানীয় প্রশাসন, প্রশাসন কর্তৃক আপাৎকালীন পরিস্থিতি ঘোষণাও বিধিনিষেধ অরোপ করা (ধারা ৩), কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক (ধারা ৪) এবং শাস্তি বিধান(ধারা ৫) বিরুদ্ধে কোনো মামলা আদালতে গ্রাহ্য হবেনা (ধারা ৯(১))।

৫) আধিকারিকের 'গুড ফেইথ' অর্থাৎ সরল মনে করা কাজের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাবেনা (ধারা ১০)।

এ যেন প্লেগের স্মৃতিকে মনে করিয়ে দেওয়া। ঐতিহাসিক মৃদুলা রামান্না তার ২০১২ সালে প্রকাশিত Health Care in Bombay Presidency, 1896 – 1930 বইতে লিখেছেন যে প্লেগের প্রাথমিক বছরগুলিতে বৃটিশ স্বাস্থ্য কর্মীরা গরীব শ্রমিক বস্তিগুলিতে ঢুকে, অসুস্থ ব্যক্তিদের সংক্রমণবাহক মনে করে জোর করে বাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে বার করে, নামমাত্র পরীক্ষা করে তাদের পৃথকীকরণ করে ফেলে রাখতো। জীবাণুমুক্তিকরণের নামে বাড়িগুলি ভেঙ্গে ফেলা, খোঁড়া এবং পুড়িয়ে ফেলার মত অযৌক্তিক কাজও তৎকালীন বৃটিশ সরকারের সম্মতি পায়। গরীব ভারতীয় রেলযাত্রীদের জিনিসপত্র, বাক্স প্যাঁটরা এমন কি পরনের জামাকাপড়ও ফিনাইলে চুবিয়ে দিতে তাদের বাধেনি।

আইনের দ্বিতীয় অনুসূচীতে মহামারির সম্ভাব্য এন্ডেমিক যে ৩৩টি অসুখগুলি লিপিবদ্ধ করা আাছে তাদের মধ্যে যেমন জৈব সংত্রাসের কারণ হিসাবে রয়েছে অ্যানথ্রাক্স কিন্তু সাথেই রয়েছে কলেরার জীবাণু এবং চিকেন পক্স, কলেরা, ডেঙ্গু, টাইফায়েড, খাবার বিষক্রিয়া থেকে ডায়রিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, হাম, হেপাটাইটিস যে অসুখগুলি আমাদের সমাজে আকছার এনডেমিক হিসাবে ঘটে।

যদিও আইনের নাম হচ্ছে জনস্বাস্থ্য আইন এবং এর প্রত্যেকটি পাতায় জনস্বাস্থ্যের দোহাইও দেওযা হচ্ছে কিন্তু জনস্বাস্থ্য বিজ্ঞানের বিন্দুবিসর্গ নেই। জনস্বাস্থ্য মানে কেবল রোগ মুক্ত জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিযুক্ত খাবার, পরিশ্রুত জল, পরিচ্ছন্ন বাসস্থান ও নিকাশি ব্যবস্থার আভাবকে পূর্ণ করা নাকি কেবল মহামারী, জৈব সন্ত্রাসের মুকাবিলা। রোগমুক্ত হলেই হবেনা, শরীর ও পরিবেশ ও সুস্থ থাকতে হবে। পুষ্টিযুক্ত খাবার, সুস্থ শরীর ও পরিবেশের গল্প কোথাও নেই।

ভাইরাস ও জৈব সন্ত্রাস দুটি পৃথক বিষয় যাদের মধ্যে কোনো মিল নেই এবং কোনোভাবে একসাথে রাখা যায়না। দুটির ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আলাদা। জৈবসন্ত্রাস হচ্ছে অপরাধ, কিন্তু মহামারী ছড়ায় ভাইরাসের কারণে যা মানুষের নিয়ন্ত্রণে নয়। মহামারী মোকাবিলার জন্য দেশে যে আইনগুলি আবহমান কাল থেকে রয়েছে যেমন - Indian Port Act 1908, Live Stock Importation Act 1898, Air Craft Rules 1937 এবং Drug and Cosmetic Act 1940 যথেষ্ট। বিগত দুবছরের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি না ঘটিয়ে আনা হচ্ছে অত্যধিক দমনমূলক আইন যাতে কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানীয় প্রশাসনের হাতে যে ক্ষমতা বর্তানো হয়েছে তার অপব্যাবহার অবশ্যাম্ভাবী। উল্টোদিকে রোগীর কোনো অধিকার নেই। তার যে সময়মত, চিকিৎসার অধিকার আছে এই টুকুও বলেনি জনস্বাস্থ্য আইনে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা কিন্তু সরকারের দায়িত্ব যা পালন করা সম্ভব নয় সরকার প্রণোদিত ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিগত মালিকানার চিকিৎসা পরিষেবার বাজারে যেখানে মুনাফা এবং আরও মুনাফাটাই হচ্ছে মূলমন্ত্র। আবার রাষ্ট্র ও চাইছে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের নানান দিক তার নিয়ন্ত্রণে থাকুক। তাই বাড়ছে নজরদারী - কখোনো আধার কার্ডকে নানান পরিষেবার সাথে সংযুক্ত করে কখোনো নাগরিকত্বের নামে আর অতিসাম্প্রতিক ভোটার কার্ডের সাথে। এই দিশায় আর একটি সংযোজন হচ্ছে জনস্বাস্থ্য আইন।

জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিজহাতে ফেরত পেতে গেলে দরকার ব্যাপক আলোচনা সমালোচনার মধ্য দিয়ে , সর্বসাধারণের মতামতকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে জনমত সংগ্রহ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া।ঔষধ কোম্পানিসহ স্বাস্থ্য পরিষেবার রাষ্ট্রীয়করণের জোরালো দাবী তুলতে হবে। সরকারি হাসপাতালগুলোর পরিকাঠামো ও পরিচালন ব্যাবস্থার মানোন্নয়ন করতে হবে যাতে দেশের সব মানুষ সমান মানের চিকিৎসা পেতে পারে। ঔষধ কোম্পানির অর্থে নিয়ন্ত্রিত 'হু' এর সাথে চুক্তিবদ্ধ না হয়ে তার নির্দেশে মহামারী ঘোষণা এবং অনির্ভরযোগ্য rtpcr এর মতো পরীক্ষা বাতিলের দাবীও তুলতে হবে। কোনো ঔষধ, ইনজেকশন বা ভ্যাকসিন বাধ্যতামূলক করার বিরোধিতা করতে হবে। কোনো পরিস্থিতিতেই জীবিকাহরণকারী লকডাউন ঘোষণা করা যাবে না। তবেই আমরা আমাদের জীবনকে নিজের হাতে ফিরে পাবো।

• কৃতজ্ঞতা স্বীকার - ডাঃ গৌতম দাস, 'প্যানডেমিক চুক্তি ও প্রস্তাবিত আইন, মৌলিক অধিকার হরণে জনস্বাস্থ্যের দোহাই'; মেহনতি পাবলিকেশন, ২০২২

অনিশ্চিৎ ন্যায়

(উত্তর পূর্ব দিল্লিতে সংগঠিত হিংসার বিষয়ে নাগরিক কমিটির প্রতিবেদন)

অনুবাদ:পার্থপ্রতীম দাশগুপ্ত

২০২০ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারী উত্তর পূর্ব দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক হিংসার বলি হয়েছেন ৫৩ জন, এবং ২০০-র বেশী মানুষ আহত হয়েছেন। বাড়িঘর, স্কুল, বাণিজ্যিক সংস্থা, প্রার্থনা স্থলে আক্রমণ চালানো হয়েছে।

মানুষের কষ্ট এবং সামাজিক ক্ষতি ছাড়াও, আইন শৃঙ্খলার বিপর্যয় ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে নানা কথা উঠেছে। এই সব আলোচনার অন্যতম ছিল জাতীয় রাজধানীর একটি এলাকায় হিংসা ছড়িয়ে পড়া আটকাতে রাষ্ট্রযন্ত্রের ব্যর্থতা এবং ত্রাণ প্রচেষ্টার ফাঁকগুলি নিয়ে উদ্বেগ। সম্প্রচার মিডিয়ার কিছু অংশ দ্বারা চালিয়ে যাওয়া পক্ষপাতদুষ্ট প্রচারগুলি নিয়েও উদ্বেগ ছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, Constitutional Conduct Group (প্রাক্তন সরকারী কর্মচারীদের একটি পাবলিক স্পিরিটেড গ্রুপ) এই হিংসা ও তার পরবর্তী ঘটনাবলীর (acts of commission and ommission) একটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করে একটি সমসাময়িক রেকর্ড তৈরি করার জন্য নিম্নলিখিত অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে একটি কমিটি গঠন করে।

১) বিচারপতি মদন বি লোকুর, ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারক (চেয়ারপার্সন);

২) বিচারপতি এপি শাহ, মাদ্রাজ ও দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এবং প্রাক্তন চেয়ারপার্সন, ভারতের আইন কমিশন;

৩) বিচারপতি আর.এস. সোধি, দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি;

৪) বিচারপতি অঞ্জনা প্রকাশ, পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি;

৫) G.K. পিল্লাই, আইএএস (অব.), প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র সচিব, ভারত সরকারের;

৬) ডঃ মিরান চাদা বোরওয়াঙ্কর, আইপিএস (অব.), প্রাক্তন মহাপরিচালক, ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ এবং

উন্নয়ন, ভারত সরকার।

ডক্টর মিরান চাদা বোরওয়াঙ্কর কমিটি থেকে কাজের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কমিটির

প্রতিবেদনটি বাকি পাঁচ সদস্য দ্বারা রচিত।

২০২২ সালের অক্টোবর মাসে এই কমিটির রিপোর্ট (Uncertain Justice) প্রকাশিত হয়েছে। রিপোর্টটি ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। প্রথম পাঠের পর যা জরুরী মনে হয়েছে তার ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন।

সাম্প্রদায়িক হিংসার মাসগুলিতে সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মেরুকরণ, বিশেষ করে মুসলিম বিরোধী বিদ্বেষ, ইচ্ছাকৃতভাবে ইন্ধন দেওয়া হয়েছিল। ডিসেম্বরে পাস হওয়া নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন, 2019 (CAA) এবং ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্ভাব্য বর্জনের সম্মিলিত প্রভাব থেকে মুসলিম সম্প্রদায় নাগরিকত্ব হারানোর গভীর আতঙ্কে ভুগছিল। 2019 সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি, এই আইনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভ শুরু হয়। দিল্লি সিএএ-বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল, উত্তর পূর্ব দিল্লিতে একাধিক অবস্থান বিক্ষোভ চলছিল। এই পটভূমিতে, জানুয়ারিতে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে গতি আসে। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) একটি বিভাজনমূলক বর্ণনার মধ্যে সিএএ ইস্যুতে তার নির্বাচনী প্রচারকে কেন্দ্রীভূত করেছিল। সিএএ-বিরোধী বিক্ষোভকে দেশবিরোধী এবং হিংসাত্মক হিসেবে চিহ্নিত করা। বিক্ষোভকারীদের প্রার্থীদের দ্বারা "বিশ্বাসঘাতক" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং দলের নেতারা, যেমন কপিল মিশ্র এবং অনুরাগ ঠাকুর, নির্বাচনী সমাবেশে এবং প্রকাশ্য বিক্ষোভে "গোলি মারো" (বিশ্বাসঘাতকদের গুলি কর) স্লোগানের আকারে তথাকথিত "বিশ্বাসঘাতকদের" বিরুদ্ধে হিংসার আহ্বান, আকস্মিকভাবে পুনরাবৃত্তি হয়েছে, কোন নিন্দা ছাড়াই। প্রতিবাদ এবং মুসলিম বিরোধী বিদ্বেষ টেলিভিশন নিউজ চ্যানেল এবং সামাজিক মিডিয়া দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। ১৩ই জুন, দিল্লি হাইকোর্ট ঠাকুরের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করার একটি পিটিশন এফ আই আর দাখিল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন না থাকার জন্য খারিজ করে দিয়েছিল।

এই কমিটি টেলিভিশন মিডিয়ার প্রাইমটাইমের ডিসেম্বর ২০১৯-ফেব্রুয়ারি ২০২০ এ সবচেয়ে বেশি দেখা ছয়টি টেলিভিশন নিউজ চ্যানেলের সম্প্রচারিত পর্বগুলির উপর ফোকাস করে সিএএ এবং বিক্ষোভ সংক্রান্ত বার্তাগুলির একটি অভিজ্ঞতামূলক বিশ্লেষণ করে। এই চ্যানেলগুলি ছিল রিপাবলিক, টাইমস নাউ (ইংরেজি),

আজ তক, জি নিউজ, ইন্ডিয়া টিভি, এবং রিপাবলিক

ভারত (হিন্দি)। কমিটি বিভিন্ন সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে প্রাসঙ্গিক পোস্ট পরীক্ষা করে। চ্যানেলগুলি সিএএকে ঘিরে ইভেন্টগুলির প্রতিবেদন তৈরি করেছে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কুসংস্কার এবং সন্দেহের সাথে "হিন্দু বনাম মুসলমান" হিসাবে সমস্যাগুলি দেখানোর উদ্দেশ্যে। এই প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল সিএএ-বিরোধী বিক্ষোভকে বদনাম করা, অপ্রমাণিত ষড়যন্ত্রের তত্ত্বগুলিকে সমর্থন করা এবং তাদের জোরপূর্বক বন্ধের আহ্বান।

দিল্লি পুলিশ দাবি করেছে যে যারা সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের আয়োজন করেছিল তারাই এই হিংস্র কার্যকলাপ চালিয়েছিল এবং এটা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারকে বদনাম করার জন্য একটি বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ । তারা আরো দাবি করেছে যে বিক্ষোভকারীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী উদ্দেশ্য ছিল এবং "নাগরিক আইন অমান্যের মুখোস" ব্যবহার করে তারা সরকারের স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে চেয়েছিল। এসব ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী ও ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

কমিটি, প্রতিবেদনে আরও বলেছে যে দিল্লি সরকার হিংসাত্বক ঘটনাগুলি যখন ঘটছিল তখন হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য কিছুই করেনি। তবে, এটি স্বীকার করেছে যে শহরের পুলিশ কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে থাকায় দিল্লি সরকারের হিংসা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সীমিত ছিল।

কমিটি বলেছে, বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের মামলায় দিল্লি পুলিশ তার চার্জশিটে সন্ত্রাসের অভিযোগকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য যে প্রমাণগুলি পেশ করেছে তা সন্ত্রাসের অভিযোগকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য ন্যূনতম আইনি শর্ত পূরণ করে না, এবং 2020 সালের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লির হিংসার সূচনা, ঘটনা এবং পরবর্তী ঘটনাগুলি "গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভয়ানক অবক্ষয়"।

কমিটি বলেছে যে দিল্লি পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সাম্প্রদায়িক হিংসা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, "২৪ ও ২৫শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা এবং সরকারী কর্মকর্তারা যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তা বারবার আশ্বাস দিলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল বাস্তব পরিস্থিতির ঠিক উল্টো। "যদিও দিল্লি পুলিশের দ্বারা প্রচারিত অভ্যন্তরীণ সতর্কতাগুলি ২৩ ফেব্রুয়ারি উত্তর পূর্ব দিল্লিতে পুলিশ মোতায়েন বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে, সরকারী তথ্য দেখায় যে মোতায়েন শুধুমাত্র ২৬ ফেব্রুয়ারিতে বেড়েছে।"

কমিটি বলেছে যে ২৪ ফেব্রুয়ারি এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি পুলিশ দাঙ্গা সংক্রান্ত সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ফোন পেয়েছে, তবে এই দিনগুলিতে পুলিশ কর্মীদের মোতায়েন বাড়ানো হয়নি। ব্যাখাহীন বিলম্বিত বিবৃতির ভিত্তিতে দিল্লি পুলিশের দাঙ্গা চালানোর পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আইনি প্রক্রিয়ায় গ্রহণযোগ্য নয়। তথাকথিত বৃহত্তর ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত মামলা এবং হিংসার অন্যান্য প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের মধ্যে বেশ কিছু দ্বন্দ্ব এবং অসঙ্গতি ছিল।

আম আদমি পার্টির নেতৃত্বাধীন দিল্লি সরকার "পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য নাগরিক মধ্যস্থতা এবং রাষ্ট্রনায়কত্বের ভূমিকা পালন করতে" ব্যর্থ হয়েছে, কমিটি বলেছে। দিল্লি সরকারও ক্ষতিগ্রস্তদের সময়মত ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণ দেওয়া নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। কমিটি দেখতে পেয়েছে যে ক্ষতিপূরণের দাবির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নিযুক্ত একজন দাবি কমিশনার ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত ২,৫৬৯টি দাবির মধ্যে ১,৪২৫টি পরীক্ষা করেছেন৷

কমিটি বলেছে যে সরকার কর্তৃক বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের ব্যবহারের ধরণগুলি একপেশে। আইনটি দীর্ঘায়িত প্রাক-বিচার এবং হেফাজতের অনুমতি দেয় এবং জামিনের জন্য অত্যন্ত সীমিত ভিত্তি প্রদান করে, "ইউএপিএ অভিযুক্তরা প্রায়শই অপর্যাপ্ত প্রমাণের কারণে খালাস পায়, তবুও, প্রায়শই বছরের পর বছর ধরে হেফাজতে থাকতে বাধ্য হয়," কমিটি বলেছে। "এটি নিশ্চিত করে যে আইনি প্রক্রিয়া নিজেই শাস্তি হয়ে উঠবে।" প্যানেল বলেছে যে আইনটি জরুরীভাবে পর্যালোচনা করা দরকার।

প্রতিবেদনের লেখকরা ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে হিংসার সমস্ত কারণগুলির কালানুক্রমিক উন্মোচনের জন্য একটি তদন্ত কমিশনের আহ্বান জানিয়েছেন ।

এপিডিআর শ্রীরামপুর শাখার সদস্য শ্রী সব্যসাচী দাস ও এপিডিআর কৃষ্ণনগর শাখার সদস্য মনোতোষ মুখার্জী (নেপাল দা)-র মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত।

PUCL প্রেস বিবৃতি

প্রফেসর সাই বাবা ও অন্য পাঁচ জনের বেকসুর খালাস আদেশের স্থগিতকরণ: একটি বিপজ্জনক নজীর যা একদিকে পদ্ধতিগত রক্ষাকবচকে গুরুত্বহীন করে, অন্যদিকে ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারকে খর্ব করতে চায়

অনুবাদ:অমলকৃষ্ণ রায়

যে দ্রুত ভঙ্গিতে সুপ্রিম কোর্ট বোম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চ দ্বারা প্রফেসর সাইবাবা ও অন্য পাঁচজনের বেকসুর খালাস/ কারামুক্তির ১৪ই অক্টোবর,২০২২ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে ১৬ই অক্টোবর 2022 মহারাষ্ট্র সরকারের একটি জরুরী আপিল উত্থাপনের অনুমতি দিলেন, এই ঘটনায় PUCL(People's Union for Civil Liberties) গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।এটা মেনে নেওয়া কষ্টকর, প্রফেসর সাঁই বাবা ও অন্যান্যদের মুক্তি প্রদানকারী বোম্বে হাইকোর্টের যুক্তিযুক্ত রায় যেভাবে প্রসিকিউশনের (prosecution) কেসের বাধ্যতামূলক পদ্ধতিগত রক্ষাকবচগুলির (mandatory procedural safeguards) ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটিগুলি উল্লেখ করেছিল, তা স্থগিত করা হলো।

বেকসুর খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র সরকারকে আপিলের অনুমতি দেওয়ার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্তের অস্বাভাবিকত্ব হচ্ছে যে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিত্বকারি সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা সেকেন্ড বেঞ্চের নেতৃত্বে থাকা বিচারপতি ডি উয়াই চন্দ্রচূড়ার কাছে মৌখিকভাবে বিষয়টি উত্থাপন করে বোম্বে হাইকোর্টের বেকসুর খালাস আদেশের স্থগিতাদেশ চান। " Live Law" এর রিপোর্টে জানা যায় যে বিচারপতি চন্দ্রচূড় শনিবারে বিষয়টি তালিকাভুক্ত না করতে চেয়ে কোর্টে সবার সামনে মন্তব্য করেন যে আপীলের কেসটি একমাত্র সোমবারেই তালিকাভুক্ত হতে পারে। আরো জানা গেছে যে, বিচারপতি চন্দ্রচূড় উল্লেখ করেছেন যে " তিনি (প্রফেসর সাই বাবা) বেকসুর খালাস পেয়েছেন, এখন যদি সোমবারে আমরা বিষয়টি শুনানী করি এবং ধরে নেওয়া যাক, আমরা নোটিশ পাঠাবো, সেক্ষেত্রেও আমরা (বেকসুর খালাস) আদেশ স্থগিত করতে পারবো না"। এরপর Administrative side -এর কেস হিসেবে প্রধান বিচারপতি একটি ছুটির দিন শনিবার, ১৫ই অক্টোবর ২০২২ বিচারপতি এম আর শাহ বিচারপতি বেলা ত্রিবেদী দ্বারা গঠিত বিশেষ বেঞ্চের সামনে শুনানির অনুমতি দেওয়া শ্রেয় হিসেবে বেছে নিলেন।

একটি ছুটির দিনে একটি বিশেষ বেঞ্চের কাছে রাজ্যের আপিল উপস্থিত করার সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি দেওয়ার ঘটনা থেকে দুটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সামনে উঠে এসেছে।

(১) অতীতে কোর্টের নিয়মিত কাজের ঘন্টা বা দিনের বাইরে বিশেষ অধিবেশনের অনুমতি দেওয়া হতো একমাত্র ব্যতিক্রম মূলক পরিস্থিতিতে যেমন ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর আসন্ন বিপদ বা অত্যন্ত গভীর সাংবিধানিক সংকট যেখানে কোর্টের জরুরী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। মধ্য রাতের শুনানির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ইয়াকুব মেনন বা নির্ভয়া হত্যাকারীর কেসে বন্দীর আসন্ন ফাঁসি আটকাতে অথবা অর্ণব গোস্বামী বা বিনোদ দুয়ার কেসে যেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছিল কিংবা মহারাষ্ট্র বা কর্ণাটক বিধানসভার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক অবস্থানগত পরিস্থিতি জানার কেসে। এটা অত্যন্ত বিতর্কের বিষয়, প্রফেসর সাঁইবাবা ও অন্যান্য দন্ডপ্রাপ্ত, যাঁদের বোম্বে হাইকোর্ট আইনত ও যথাযথ বেকসুর খালাস দিয়েছে, তাঁদের কেসটি "একটি গুরুতর ও অসাধারণ পরিস্থিতি" তৈরি করে কিনা যা একটি ছুটির দিনে বিশেষ অধিবেশন দাবি করে।

(২) যেটা আরো উদ্বেগ জনক যে সুপ্রিম কোর্ট একটি উপযুক্ত কোর্টের ফৌজদারি আপিল মামলার বেকসুর খালাস আদেশের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ জারি করেছে। এটা নয় যে রাষ্ট্রের সামনে যথাবিহিত আইনি পদ্ধতি অনুযায়ী বেকসুর খালাস আদেশকে চ্যালেঞ্জ করার কোন রাস্তা ছিল না। যা হোক, যখন রাষ্ট্র এক ব্যতিক্রমী পদ্ধতির সাহায্যে এক বিচারিক বেকসুর খালাস আদেশের স্থগিতাদেশ নিশ্চিত করে, তা গুরুতর ভাবে "আইনের শাসন " এর ভিত্তিকে নড়িয়ে দেয়। এর ফলে এই প্রশ্ন ওঠে যে UAPA আইনে দন্ডিত একজন ব্যক্তি কিভাবে আপিল আদালতের বেকসুর খালাস আদেশের সুবিধা পাবে ? এর ফলে ভারতের ফৌজদারী ও সাংবিধানিক বিচার ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য গুলি প্রভাবিত হবে। এটা ঘটনা যে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের এই নজির সৃষ্টিকারী আদেশটি বেকসুর খালাস আদেশের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ চাইতে রাষ্ট্রকে আরো উৎসাহিত করবে, ফলতঃ ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার কে ক্ষুন্ন করবে।

সুপ্রিম কোর্টের এই অস্বাভাবিক তৎপরতা শুধুমাত্র ন্যায় বিচারকে আরো সুপ্রযুক্ত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রচলিত রীতিনীতিকে উপেক্ষা করা নয়, বরং এটি বোম্বে হাইকোর্টের সংবিধানের ওপর আস্থা রেখে আইনশাস্ত্র অনুযায়ী পরিশ্রমসাধ্য রায়দানের এই প্রক্রিয়াকেই বাতিল করে।

প্রফেসর সাইবাবার আপিলের কেসে বোম্বে হাইকোর্টের প্রকৃত অবদান হল যে কোর্ট জোর দিয়ে বলেছে, UAPA এর মতো আইনগুলি যা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিগত রক্ষাকবচগুলি

মেনে চলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতি ঘটায়,তা প্রয়োগ করার সময় রাষ্ট্র (প্রসিকিউশন)- এর বর্তমান পদ্ধতিগত রক্ষাকবচগুলি মেনে চলার কঠোর বাধ্যবাধকতা আছে।

পদ্ধতিগত রক্ষাকবচ গুলি বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত কারণ এন্টি টেরর আইনগুলির অপপ্রয়োগের ইতিহাস রয়েছে। UAPA-এর পূর্ববর্তী আইন TADA(Terrorist and Disruptive Activists (Prevention) Act, 1987,) ও POTA(The Prevention ofTerrorism Act, 2002) - এর উল্লেখ করে বোম্বে হাইকোর্ট বলেছে যে "সেগুলি প্রায় দানবীয় আইন বলে অনুভূত হয়" এবং "রাজনৈতিক ও আদর্শগত অবস্থান নির্বিশেষে ওই আইনগুলির ধারাগুলি জঘন্য অপপ্রয়োগের সক্ষমতা ও বিরোধিতার কণ্ঠস্বরকে দমন করার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছে"।

বোম্বে হাইকোর্ট যে UAPA -এর পদ্ধতিগত রক্ষাকবচগুলির উল্লেখ করেছে তা আইনের 45নং ধারায় লিপিবদ্ধ আছে। বোম্বে হাইকোর্ট মত প্রকাশ করেছে যে কোর্ট কেস বিচারাধীনে (Cognizance) নেবার আগে অবশ্যই কেন্দ্র বা রাজ্যকে অনুমোদনের (sanction) পদ্ধতিগত রক্ষাকবচের শর্ত মানতে হবে। আইনের 45(2) ধারা অনুযায়ী কেবলমাত্র "কেন্দ্র/ রাজ্য দ্বারা নিয়োজিত সংস্থা (Authority)-এর রিপোর্ট বিবেচনার পর" প্রসিকিউশনের অনুমোদন দেওয়া যাবে। আইনের 45(2) উদ্দেশ্য হলো "তদন্তকালে গৃহীত প্রমাণ গুলির একটি স্বাধীন "পূনঃমূল্যায়ন" নিশ্চিত করা এবং সেই পুনর্মূল্যায়নের ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কেন্দ্র সরকারের কাছে একটি "সুপারিশ পেশ করা"।

একদিকে যেমন বোম্বে হাইকোর্ট ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করেছে যে নির্ধারিত সাতদিনের সময়সীমার মধ্যে রিপোর্ট পেশ করা "বাধ্যতামূলক" নয়; অন্যদিকে কোর্ট সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছে যে "অনুমোদন অভিযুক্তকে অবাঞ্ছিত প্রসিডিউশন এবং বিচারের যন্ত্রণা ও মানসিক আঘাত থেকে রক্ষাকবচ প্রদান করার অভিনন্দন যোগ্য উদ্দেশ্যকে মান্যতা দিয়েছে" এবং UAPA -এর কঠোর ধারা গুলির নিরিখে যথাবিহিত আইন পদ্ধতির (due process of law) একটি অবিচ্ছিন্ন দিকচিহ্ন হয়ে উঠেছে।

কোর্ট আরো ব্যাখ্যা দিয়ে বলে যে অনুমোদনের ভিত্তি হবে প্রমাণের স্বাধীন পুনর্মূল্যায়ন, যেমনটা 45(2) ধারাতে বলে দেওয়া আছে এবং এটি বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োজনীয়। এই ব্যাখ্যা উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য নির্ভর করে তৎকালীন গৃহমন্ত্রী পি চিদাম্বরমের পার্লামেন্টে বিল (2008-09) পেশ করার সময়কালীন বিবৃতির ওপর। যে বিবৃতি বলেছিল," প্রশাসন কেস নিবন্ধন (Register) করুক, প্রশাসন কেসের তদন্ত করুক, কিন্তু প্রসিকিউশনের অনুমোদন দেবার আগে তদন্তে যে প্রমাণ পাওয়া গেল সেগুলিকে অবশ্যই একটি স্বাধীন সংস্থা দ্বারা মূল্যায়ন করাতে হবে"।

বোম্বে হাইকোর্ট সঠিক ভাবেই উপসংহারে পৌঁছয় যে " আমরা এই মতে পৌঁছতে চাইছি যে প্রতিটি রক্ষাকবচ, যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন,তা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে অভিযুক্তকে প্রদান করা হয়েছে এবং সেগুলি প্রবল উদ্দীপনা সহকারে রক্ষা করতে হবে"।

পদ্ধতিগত রক্ষাকবচ এবং বিশেষত "প্রমাণের স্বাধীন পূনঃমুল্যায়ন" এর বাধ্যবাধকতার চরিত্রকে জোর দিয়ে সামনে এনেছে বোম্বে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট এই গুলিকে পুরোপুরিভাবে অবহেলা করেছে।

দুঃখজনকভাবে বর্তমান রায়টি সুপ্রিম কোর্টের ইতিহাসের একটি নিম্নগামী রায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়।সেটি হলো 'ADM Jabalpur vs.Shivkanta Shukla (AIR1976 SC 1207)' -এর রায়, যেখানে বেঞ্চের সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যক সদস্যরা মত দিয়েছিলেন যে ইমারজেন্সির সময় MISA (The Maintenance of Internal Security Act,1971) তে কোন ব্যক্তিকে আটক করার সময় আইনে লিপিবদ্ধ পদ্ধতি মানার বাধ্যবাধকতা নেই কারণ এই সময়ে Article 21(Protection of Life and Personal Liberty, Constitution of India) - এ অন্তর্ভুক্ত জীবনের অধিকারকে স্থগিত রাখা আছে। পদ্ধতির প্রতি এই স্বেচ্ছাচারী পন্থাকে নিন্দা করে বিচারক খান্না তার ঐতিহাসিক বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করে সঠিকভাবেই বলেন যে " আমাদের মনে রাখা উচিত যে ব্যক্তি স্বাধীনতার ইতিহাস হচ্ছে মূলত পদ্ধতি মেনে চলার জন্য জেদ বজায় রাখার ইতিহাস"

ট্রায়াল কোর্টের দণ্ডের অনায্যতার প্রতি ইঙ্গিত করে বোম্বে হাইকোর্ট বিচক্ষণতার সঙ্গে একটি রায় প্রদান করেছে। কোট পর্যবেক্ষণ করেছে যে UAPA স্পেশাল কোর্ট/ সেশানস্ কোর্ট, গড়চিরৌলি বলেছে "যাবজ্জীবনের দন্ড অভিযুক্ত নম্বর 6- জি এন সাই বাবার জন্য যথেষ্ট শাস্তি নয় এবং কোর্টের হাত-পা বাঁধা কারণ আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে জীবনের প্রতিবিধান দেওয়া আছে"।সেশানস্ কোর্টের পর্যবেক্ষণকে যথার্থভাবেই নিন্দা করেছে বোম্বে হাইকোর্ট এবং মন্তব্য করেছে "আমরা মাননীয় সেশানস্ বিচারকের এই অযাচিত পর্যবেক্ষণকে মান্যতা দিচ্ছি না,এর অনিচ্ছাকৃত ফল হিসেবে রায়টি আবেগবর্জিত বস্তুনিষ্ঠতার(Dispassion-

ate objectivity) অনুপস্থিতির অভিযোগের সামনে ভঙ্গুর হয়ে পড়বে"।

দুর্ভাগ্যজনক যে সুপ্রিম কোর্ট একটি সাংবিধানিক কোর্ট বোম্বে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ কে অগ্রাহ্য করে সেই একই ট্রায়াল কোর্টের রায়ের পুর্নোল্লেখ করেছে। বোম্বে হাইকোর্টের মতে সেশানস্ কোর্টের রায়ে "আবেগবর্জিত বস্তুনিষ্ঠতা" অনুপস্থিত এবং সেই রায়ের উপরে আস্থা রেখে সুপ্রিম কোর্ট এমন এক সিদ্ধান্তের অনুমোদন দিয়েছে যেটি প্রাথমিক বিচারে পক্ষপাত দুষ্ট ও ন্যায়পরায়ণতায়হীন এবং যেটি ন্যায় মানে ন্যায্য -এই ধারণাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এছাড়াও বোম্বে হাইকোর্টের যুক্তিতে অগ্রাহ্য করে সুপ্রিম কোর্ট সেই যুক্তিকে অন্তর্নিহিতভাবে মান্যতা দিল, যে যুক্তি বলে, যারা "আরবান নকশাল", তারা আইনের পদ্ধতিগত রক্ষাকবচের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য নন। এই কাজ করে সুপ্রিম কোর্ট তো মানুষকে ভয় বা অনুগ্রহ ছাড়া "আইনের সমান সুরক্ষা" প্রদান নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতাকে গুরুত্বহীন করে দিল।

প্রফেসর সাঁইবাবা শারীরিকভাবে ৯০ শতাংশ অক্ষম এবং নাগপুর সেন্ট্রাল জেলের অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার কারণে ভুগেছেন-এই তথ্যকে শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট বিবেচনায় আনেনি। তিনি প্রায় আট বছর ধরে বন্দী রয়েছে এবং নিজে নিজের দেখাশোনা করতে পারেন না। বন্দিদের স্বাস্থ্য রক্ষার অধিকারের প্রতি এই অবহেলার শোকাবহ পরিণতি হতে পারে, যেমনটা ঘটেছিল এই কেসের আরেকজন দণ্ডপ্রাপ্ত পান্ডু নারটের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। যদি সুপ্রিম কোর্ট অন্তত প্রফেসর সাই বাবাকে গৃহবন্দী রাখার অনুমতি দিত সেক্ষেত্রে তাঁর পরিবার তাঁর জন্য যথাযথ চিকিৎসা ও যত্নের ব্যবস্থা করতে পারত। যেহেতু প্রফেসর সাই বাবার দেশ থেকে পালিয়ে যাবার ঝুঁকি নেই, সুপ্রিম কোর্ট তাকে গৃহবন্দী রাখার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে পারতো। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে সংবিধান অনুযায়ী প্রাপ্য সহানুভূতি দেখায়নি। সুপ্রিম কোর্টের বোম্বে হাইকোর্টের প্রফেসর সাই বাবাকে মুক্তি দেওয়ার আদেশকে স্থগিত রাখার ফল হল যে প্রফেসর সাই বাবা জেলেই থাকবেন যতদিন না সুপ্রিম কোর্ট বোম্বে হাইকোর্টের মুক্তি আদেশের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র পুলিশের আপিল কেসের নিষ্পত্তি করবে। চূড়ান্ত প্রশ্ন হল যে যদি শেষপর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট ট্রায়াল কোর্টের রায় কে বহাল রাখে তাহলে কি হবে?

যদি সুপ্রিম কোর্ট তাই করে, সেক্ষেত্রে প্রফেসর সাই বাবা ও অন্য দণ্ডপ্রাপ্তদের অন্যায় বন্দিদশায় থাকতে হবে। এটি বিচার ও ন্যায়ের ধারণাকে জোরে ধাক্কা দেবে। যদি শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট এই মতামতে পৌঁছে যে UAPA ধরনের বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তাকে মান্যতা দেওয়ার শুধুমাত্র পদ্ধতিগত ও নির্দেশমূলক এবং উপাদানগত ও বাধ্যতামূলক নয়, সেক্ষেত্রে এটি একটি বিয়োগান্তক ঘটনায় পর্যবসিত হবে। এবং তাহলে বলতে হবে, ADM Jabalpur-এর প্রেতাত্মা আবার তার খেল দেখাতে ফেরত এসেছে।

খড়গপুর আইআইটিতে প্রাতিষ্ঠানিক হত্যার প্রতিবাদ

খড়গপুর আইআইটির তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ফৈয়জান আহমেদের অস্বাভাবিক মৃত্যু এবং হোস্টেলের বদ্ধ ঘরে তার পচা গলা দেহ উদ্ধার ভয়ংকরভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে আইআইটির সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের। ডিরেক্টর ও ডিনের পদত্যাগের দাবীতে উত্তাল ক্যাম্পাস। তাদের অভিযোগ কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ এই মৃত্যুর জন্য দায়ী। ছাত্র-ছাত্রীদের আরও অভিযোগ কলেজের ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য মাত্র তিনজন কাউন্সেলর। আইআইটিতে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর অস্বাভাবিক চাপ। এই তিন কাউন্সেলর মোটেই যথেষ্ট নয়। গত তিন বছরে পাঁচ জন ছাত্রছাত্রীর আত্মহত্যা তার প্রমাণ। শুধু তাই নয় ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো-মন্দের খবরও কর্তৃপক্ষ সেভাবে রাখে না। ফৈয়জান যে পরপর চারটি সেমিস্টার পরীক্ষায় বসেনি সে খবরও কেউ রাখেনি। তার বাড়িতেও কিছু জানায়নি। ফৈয়জান যে হোস্টেল পাল্টেছে সে খবর কর্তৃপক্ষ জানতো না। তাকে কোনরকম কাউন্সেলিং করা হয়নি। মৃত্যুর খবর পেয়ে তার বাবা মা এলে কর্তৃপক্ষের তরফে তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, ছাত্ররা প্রশ্ন তুললে তাদের পুলিশ কেসের ভয় দেখানো হয়। ছাত্রছাত্রীরা সাধারণ সভা ডাকলে ৫০০০ ছাত্রছাত্রী জড়ো হয়। গত একুশে সেপ্টেম্বর ছাত্রছাত্রীদের সাধারণ সভায় সারা রাত থাকতে বাধ্য হন ডিরেক্টরের। ডিরেক্টরের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল ছিল সেই সভা। ডিন অফ স্টুডেন্টস পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরে ডিরেক্টর অসুস্থ বলে হাসপাতালে ভর্তি হলে সভা শেষ হয়। কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান যেদিন ক্যাম্পাসে ফিরবেন সেদিনই আবার সাধারণ সভা ডাকা হবে। এদিকে বাবা-মা ছেলের মৃত্যুর তদন্তের দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার থাকে পড়াশুনোর চাপ ছাড়াও কোন গণতান্ত্রিক পরিবেশেই নেই ক্যাম্পাসে। মানসিক চাপ হালকা করার কোন ব্যবস্থাই থাকে না। সমগ্র বিষয়টাকে যান্ত্রিকভাবে দেখা হয়। কিন্তু মানুষ তো যন্ত্র নয়। পড়াশুনা আর ক্যারিয়ারের নামে এরকম অসুস্থ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়াটা আসলে প্রাতিষ্ঠানিক হত্যাই। উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে এরকম মানবাধিকারহীন পরিবেশ আর কতদিন! বন্ধ হোক এই অত্যাচার।

মানবাধিকার সনদ ও ভারতের সংবিধান এবং...

সুরঞ্জন প্রামাণিক

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার-ধারণার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট

'মানবাধিকার'— এই ধারণায় যাওয়ার আগে আমাদের 'অধিকার' ধারণা মনে রাখতে হবে। তারও দীর্ঘ ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস যুদ্ধ ও রক্তপাতের। তারই মধ্যে কোথাও কোথাও মানুষের প্রতি 'প্রভু'/ শাসকদের 'করুণা' প্রদর্শন, তা-ই সামান্য 'অধিকার'-এ রূপ পেয়েছে। কিন্তু অব্যাহত থেকেছে যুদ্ধ— আজ পর্যন্ত যুদ্ধের চলমানতার মধ্যেই রাষ্ট্রশক্তি অধিকার দিয়েছে, পাওয়া সেই অধিকার খর্ব করেছে শাসক সহায়ক শ্রেণী...

আধুনিক ইতিহাসের রেখাচিত্র

প্রথম শিল্প বিপ্লব (১৭৬০ স্টিমশক্তি আবিষ্কার >) মানুষের সমাজ বিবর্তনের ধারায় এক নতুন দ্বন্দ্বের পরিসর তৈরি করে দিয়েছিল। প্রধান দ্বন্দ্ব ছিল শ্রমিক-মালিকের মধ্যে (নগর > নাগরিক পরিসরে)। তা থেকে নগর-সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রমিক আন্দোলনের পাশাপাশি, গড়ে উঠছে নারীর অধিকার আন্দোলন... শ্রমিক জোটবদ্ধ হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টিতে, ১৮৪৮ সালে প্রকাশ হচ্ছে 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার'; ওই একই বছরে নিউ ইয়র্ক-এ 'ওমেন রাইটস কনভেনশন' হয় যা 'সেনেকা ফলস্ কনভেশন' নামে খ্যাত, নারী-অধিকারের জন্য প্রথম সম্মেলন।

অর্থাৎ অধিকার আন্দোলন চলছে, যুদ্ধও চলমান।

১৮৭০— ২য় শিল্পবিপ্লব বাষ্পশক্তির জায়গা নিচ্ছে বিদ্যুৎশক্তি— মানুষের শ্রমশক্তি আরও উদ্বৃত্ত, এক কথায় মানুষ উদ্বৃত্ত— এই উদ্বৃত্ত মানুষেরাই নানা 'ধর্মযুদ্ধ' করেছে, 'দেশরক্ষা'র সৈনিক হয়েছে (মানুষকে মেরে মানুষই মরেছে— মারো অথবা মরো)। এই চলমানতায় 'রেডক্রস' গঠনের আগে (১৮৬৩) সৈনিক মানুষের 'জীবনের অধিকার' বোধহয় ছিল না যেমন ছিল না যুদ্ধক্ষেত্রে থাকা কর্মরত মানুষের। যুদ্ধকে মেনে নিয়ে 'জীবন রক্ষা' বিষয়ে নানা চুক্তি হয়েছে অর্থাৎ দেওয়া হয়েছে যুদ্ধের আবহাওয়ায় 'জীবনের অধিকার'।

আপনারা জানেন যে, 'রেডক্রস'-এর প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ডুনান্টকে প্রথম নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল (১৯০১)।এই উল্লেখ এ কারণে যে, যুদ্ধ জয়ের অন্যতম উপায় 'ডিনামাইট'-এর স্রষ্টা আলফ্রেড নোবেল ও যুদ্ধের ক্ষত নিরাময়ের 'উপায় উদ্ভাবক' হেনরি ডুনান্ট উভয়-ই যুদ্ধকে অনিবার্য ধরে নিয়ে মানবকল্যাণে তাঁদের অবদান রাখতে চেয়েছেন— কেননা, দুজনই ধনতান্ত্রিক সমাজের সদস্য— ধনতন্ত্র যুদ্ধ ছাড়া বাঁচতে পারে না। এবং যেহেতু কমিউনিস্ট ইস্তাহারে শ্রেণী যুদ্ধের প্রস্তাবনা আছে, তা আবহমান যুদ্ধকে স্বীকার করেই, অতএব, অ নুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, তখনও যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলার মতো যথেষ্ট মানবিক হয়ে উঠতে পারেনি বুর্জোয়া মানবতাবাদ ।

এবং এও মনে রাখতে হবে যুদ্ধের প্রসার-কিন্তু রোখা যায়নি। দেশে-দেশে যুদ্ধ— এক সময় ছিল জল-জমি-জঙ্গল দখলের লড়াই— এটা শিল্পবিপ্লবের 'বৈপ্লবিক পরিবর্তন'-এর জন্য প্রয়োজন ছিল, একই সঙ্গে তা ছিল, আজও আছে— বাজার দখলের লড়াই। 'বৈপ্লবিক পরিবর্তন'— কথাটা যাঁরা কমিউনিস্ট ইস্তাহার পড়েছেন, তাঁদের চেনা মনে হতে পারে, অন্যদের কাছে কথাটার অর্থ যথাযথ না হওয়াই স্বাভাবিক— এই বিবেচনায় এখানে উল্লেখ করা অসঙ্গত হবে না যে, ইস্তাহারের এক জায়গায় লেখা আছে "উৎপাদনের উপকরণে অবিরাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে এবং তাতে করে উৎপাদন-সম্পর্ক ও সেইসঙ্গে সমগ্র সমাজ-সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী বাঁচতে পারে না।" বলা বাহুল্য যে, এই 'বৈপ্লবিক পরিবর্তন' অবিরাম ঘটে চলেছে যুদ্ধের মাধ্যমে, যুদ্ধের জন্য। যুদ্ধকে রুখতে অতএব, যুদ্ধের বিকল্প নেই— সেই মহাভারতের যুগ থেকে...

যুদ্ধে সওয়ার আধুনিক সময়, যুদ্ধকে রুখতে চাইছে

যে যুদ্ধ এত দিন দেশে-দেশে ঘটছিল, সেই যুদ্ধ একই সময়ে বিশ্বময়— নাইন-টেন পড়ার সময় আমাদের ইতিহাস পড়তে হয়েছে, যুদ্ধের ইতিহাস সব মনে আছে কি না বলা মুশকিল, তবু মনে করিয়ে দিই, ইংরেজ-ফরাসিরা তাদের ইউরোপের লড়াইটা আমাদের দেশের মাটিতেও করেছে, মনে পড়ছে— উপনিবেশ দখলের যুদ্ধ। তো সেই শুরু— আঞ্চলিক যুদ্ধ দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ছে... ১৯১৪ সালে তা বিশ্বের সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে কোনও 'অধিকার' ঘোষণা হয়েছিল কি না জানা নেই তবে 'লীগ অব নেশনস' গঠন করা হয়েছিল (১৯২০) এই উদ্দেশ্যে যে, পৃথিবীর দেশে দেশে যে সমস্যা তা যুদ্ধের দিকে যাওয়ার আগেই যাতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়া যায়, যাতে যুদ্ধের বীভৎস ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে না হয়! কিন্তু, চুক্তি কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছিল না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় সে লীগ থেকে বেরিয়ে যায়। তবু 'লীগ' আশায় ছিল।

এই স্বার্থ— বাণিজ্য, বাজার। আসলে তখন কোনও উপনিবেশ মানেই দখলীকৃত বাজার। বাজার দখলের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্য থেকে তথাকথিত 'বাজার'মুক্ত দেশের জন্ম হয়েছে(১৯১৭)— এ তখন ধনতান্ত্রিক বাজারের পক্ষে এক বিরাট থ্রেট। প্রায় গোটা উনিশ শতক জুড়ে যে অভাব-অনটন ভয়মুক্ত এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিল 'শ্রেণী সংগ্রামে' লিপ্ত শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষ, তা সত্য হয়েছে... এক দিকে নতুন তন্ত্রের নির্মাণ আর এক দিকে ধনতন্ত্রের 'গ্রেট ডিপ্রেশন' (১৯৩০ >)—

আবার যুদ্ধের আয়োজন/ যুদ্ধবিরোধী কথোপকথন

বাজার না পেলে ভূতগ্রস্ত ইউরোপের বণিকমহলের মৃত্যু অনিবার্য— এই অনিবার্যতাকে রুখতে আবারও যুদ্ধের আয়োজন— ২য় বিশ্বযুদ্ধ শুরু ১৯৩৯-এ। জার্মান-জাপান-ইতালি— এক পক্ষ, অন্যপক্ষ (মিত্র পক্ষ) ফ্রান্স-পোল্যান্ড-যুক্তরাজ্য; এ সব আপনারা জানেন, তবু বলার ঝোঁকে বলা— খেয়াল করুন— সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে এই যুদ্ধে ছিল না। অবশ্য পরে এরা মিত্র পক্ষে যোগ দেবে— জাপানে পারমাণবিক ধ্বংস চালাবে আমেরিকা আর হিটলারের বিশ্ববিজয় বাসনাকে রুখে দেবে 'সোভিয়েত লাল ফৌজ'।

যাই হোক, তখন যুদ্ধ চলছে— মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, সংশয় দেখা দিয়েছে কবির ভাষায় 'মানব থেকে' যাওয়া নিয়ে— 'লীগ অব নেশন'-এর সদস্যরা মিলিত হন ১৯৪৪-এ, লীগ ভেঙে দেওয়া হয়। ব্রিটেন-চীন-আমেরিকা-রাশিয়া তিন মাস ধরে এক সম্মেলন করে জাতিসংঘ বা রাষ্ট্রসংঘ গড়ে তোলে এবং এমন একটি সনদ রচিত হয় যা আজ মনে হয় ধাপ্পা; কিন্তু তখনকার দিনে তা 'অবিশ্বাস্য' রকমের বাস্তবসম্ভব সত্য ছিল! রাষ্ট্রসংঘের সনদটি আসলে 'মানবাধিকার ঘোষণা'র বুনিয়াদ। যদি কারও আগ্রহ থাকে ১৯৪৫ সালের 'Charter of the United Nations' দেখে নিতে পারেন। দেখবেন, প্রস্তাবনার শুরুতেই বলা হয়েছে 'পরবর্তী প্রজন্মসমূহকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষা করা যা দু' বার আমাদের জীবদ্দশায় মানবজাতির অবর্ণনীয় দুঃখ বয়ে এনেছে'— অর্থাৎ যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রস্তাব রাখা হচ্ছে এবং পরবর্তী সাত সাতটি অনুচ্ছেদ এই প্রস্তাবকে যুক্তিগ্রাহ্য ও অনুশীলনের আওতায় নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। আমার জানা হয়নি, রাষ্ট্রসংঘের ওই সনদে ব্রিটিশ ভারত সই করেছিল কি না। তবে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রসংঘের সদস্য এবং 'আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ'-এ অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ।

যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাবনা—

সনদ রচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ১৯৪৬ সালে, ১৯৪৫ সালেই রাষ্ট্রসংঘ 'মানবাধিকার কমিশন' গঠন করে, এই কমিশনের তত্ত্বাবধানে ১৯৪৬ থেকে১৯৪৮– প্রায় তিন বছর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রতিনিধিরা 'মানবাধিকার সনদ'-এর খসড়া রচনা করেন এবং ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ 'মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র' রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সংসদে গৃহীত হয়। এই যে ঘোষণাপত্র— এর ড্রাফট রচিত হয়েছিল যে সব অধিকার ঘোষণার কথা ইতিহাস উল্লেখ করেছে, তা মনে রেখে, বিশেষ করে, এই ড্রাফটে 'আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা' ও 'আমেরিকান বিল অব রাইটস'-এর বয়ান, প্রায় একই কেবল নতুনত্ব হল, যুদ্ধকে 'গুডবাই জানানো'।

কারও যাতে মনে না হয়, যুদ্ধকে গুডবাই জানানো কথাটার মধ্যে অতিরঞ্জন আছে তার জন্য যুদ্ধ বিরোধিতার রেডি রেফারেন্স হিসাবে ঘোষণাপত্রের প্রস্তাবনা থেকে প্রথম তিনটি অনুচ্ছেদ মন্তব্য সহ রাখার আগে হল :

যেহেতু, মানবজাতির প্রত্যেক সদস্যের সহজাত মর্যাদা এবং প্রত্যেকের সমান ও অনপনেয় অধিকারসমূহের স্বীকৃতি হল পৃথিবীতে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও শান্তির ভিত্তি (যুদ্ধ যা দিতে পারে না অতএব যুদ্ধকে উপেক্ষা করতে হবে),

যেহেতু, মানবাধিকারসমূহের অসম্মান ও অবজ্ঞার ফলেই পৃথিবীতে বর্বরোচিত কার্যকলাপ (বিশ্বযুদ্ধ) সংঘটিত হয়েছে, যা মানুষের বিবেককে আহত করেছে এবং যেখানে সমস্ত মানুষ বাক্ স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা ভোগ করবে, ভয় ও অভাব থেকে মুক্ত এমন এক বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটানো সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা (তা সমাজতন্ত্র না কি মানবিক বিশ্ব— স্পষ্ট নয়, সংশয় আছে) বলে ঘোষিত হয়েছে।

যেহেতু, শেষ পন্থা হিসাবে মানুষকে যাতে স্বেচ্ছাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (> বিপ্লব = যুদ্ধ = মানুষ খুন) করতে বাধ্য হতে না হয়, তার জন্য আইনের শাসন দ্বারা মানবাধিকারসমূহ সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন...

আরও তিনটি অনুচ্ছেদের পর রাষ্ট্রসংঘের 'সাধারণ পরিষদ সমস্ত মানুষের এবং সমস্ত জাতির অগ্রগতির একটি সাধারণ আদর্শরূপে' উক্ত 'ঘোষণাপত্র' গ্রহণ করছে 'এই উদ্দেশ্যে, যাতে প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রত্যেকটি সামাজিক সংগঠন এই ঘোষণাপত্র সর্বদা মনে রেখে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে এই সব অধিকার ও স্বাধীনতাগুলির প্রতি সম্মানপ্রদর্শনে উৎসাহিত করে' ইত্যাদি— এর পর সদস্য রাষ্ট্রগুলির

করণীয়-কথা বলা হয়েছে।

ভারতের সংবিধান রচনার প্রেক্ষাপট

(অধিকার থেকে মানবাধিকার-এ এসে পৌঁছানোর যে ইতিহাস-ক্রম তা মনে রেখে) এখন এটা সকলেই জানেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে উপনিবেশগুলিকে যে 'স্বাধীনতা' দিতে হবে, এর অনিবার্যতা কোনও রাজনীতিবিদই তখন খণ্ডন করার মতো অবস্থায় ছিলেন না। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় উদ্ভূত জাতীয় রাজনীতি তার বৈচিত্র্যের মধ্য থেকে যথার্থ 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। তার ফলে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে এবং তা 'জাতিরাষ্ট্র' গঠনের প্রক্রিয়া চালিয়ে গেছে, ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে তার কাঠামো বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তা আরও প্রকট হয়ে উঠল সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ তৈরির ক্ষেত্রে (১৯৪৬)। মনে রাখার বিষয় জাতিসংঘের 'মানবাধিকার কমিশন' গঠন ও 'ভারতের সংবিধান' রচনার জন্য 'গণপরিষদ' গঠনের সময়কাল প্রায় একই। আপনারা জানেন, 'ইসলামি জাতীয়তাবাদ' তাদের জাতিরাষ্ট্র পাকিস্তান পাওয়ার প্রেক্ষিত পাকাপোক্ত হওয়ায় খণ্ডিত ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার (যা ইউনিয়ন অফ স্টেটস বা ভারতরাষ্ট্র হবে) সংবিধান রচনার কাজ সহজ ছিল না। ফলত সংবিধান রচনার কাজ ১৯৪৭-এর শুরুর দিকে হলেও তা শেষ হতে লাগে প্রায় তিন বছর— 'ভারতের জনগণ সংবিধান নিজেদের অর্পণ' করে ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, বিশ্বের মানববৈচিত্র্যকে মনে রেখে রচিত হয়েছে মানবাধিকার সনদ। ভারতের মানববৈচিত্র্যকে এক সূত্রে গ্রন্থিত করবার জন্য 'সংবিধান' রচনার প্রেরণা ও সহায়তা দিয়েছে মানবাধিকার সনদ। এ বিষয়ে যুক্তিসূত্র :

পুনরুক্তির দোষ ঘটানো যাক : WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind…

U N Charter, 1945-এর প্রস্তাবনা অনুসারে লিখিত 'মানবাধিকার সনদ'-এর পাঠ মনে রেখে অর্থাৎ যুদ্ধের সম্ভাবনা না থাকা একটি স্বাধীন দেশ গঠন (যা একটি উপমহাদেশও বটে) মানে তার সমস্ত নাগরিককে কেবলমাত্র 'মানব' পরিচয়ে শাসন ও পোষণ করার প্রেক্ষিত রচনা করা। করতে হবে, তার জন্য সংবিধান রচনার দর্শন যে আন্তর্জাতিক হবে, এ বিষয়ে কোনও সংশয় ছিল না 'গণপরিষদ'-এর প্রাজ্ঞ রাজনীতিকদের। কেবল তা-ই নয়, এটা অনুমান করা যায় যে, পরিষদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা যুদ্ধ এড়ানো কীভাবে সম্ভব— সেই সত্য সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন এবং তা-ই প্রকাশ পেয়েছে সংবিধানের প্রস্তাবনায় :

> WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN, SOCIALIST, SECULAR, DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens… (< to save succeeding cenerations)

এর তাৎপর্য এই যে, মানবাধিকারের দর্শনকে প্রকৃতই রাজনৈতিক দর্শনে রূপ দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা সংবিধান-প্রণেতাদের ছিল। যার অনুশীলন 'অশোকের ঐতিহ্য' অনুসারে এক 'মানবিক রাজনীতি'র ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে পারত বলে আমাদের মনে হয়…

এই পর্যবেক্ষণের পক্ষে একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞের মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা হল:

রাষ্ট্রসংঘ দ্বারা অধিকৃত মানবাধিকার (১৯৪৮)-এর ঘোষণা যা আর্টিকেল ১-এ আছে, সেটা বলছে যে, "সমস্ত মানবজীবন জন্ম থেকে স্বাধীন এবং অধিকার এবং মর্যাদায় তাঁরা এক। তাঁদের মধ্যে বিচার করবার ক্ষমতা আছে এবং বিবেক আছে এবং একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপনের সময় তাঁরা সৌহার্দ্যপূর্ণ ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই সংযোগ স্থাপন করবেন।"

আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় প্রস্ফুটিত হয়েছে এই ভ্রাতৃত্ববোধের সারমর্ম (ভারতের সংবিধান পরিচয়, আচার্য ডঃ দুর্গাদাস বসু)।

আমরা যদি মানবাধিকার সনদ ও সংবিধানের মৌলিক অধিকার সনদ তুলনামূলকভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করি তা হলে খুব সহজেই এটা প্রতিভাত হবে যে, উভয় সনদই সরকারি রাজনীতি তথা সামাজিক রাজনীতির চর্চার বিষয়। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে— মানবাধিকার সনদের ৩ ধারায় রয়েছে 'জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার'-এর কথা বলা হয়েছে আর সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯ ও ২১-এ তা-ই আরও স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করে বলা আছে।

এবং কিছু কথা

এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠক নিশ্চয়ই খেয়াল করবেন যে, যা মানবাধিকার হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে তাকেই

সাংবিধানিক রাজনীতির বিষয় করা হয়েছে অর্থাৎ সরকার নাগরিককে তাঁর মানবাধিকার (= মৌলিক অধিকার) দেওয়ার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করবে। এর আর এক অর্থ, সংসদীয় দলগুলি সংবিধান সম্মত কর্মসূচি নেবে। নির্বাচনের মাধ্যমে যে দল বা দলগুলি সরকার গঠন করবে তাদের মানবিক দায় থাকবে 'প্রতিশ্রুতি' (যা মূলত নির্বাচনের সময় দেওয়া হয়) পালনের (স্বাধীনতা ৭৫ উদযাপন কালে এটা স্পষ্ট হয়েছে যথাযথ প্রতিশ্রুতি পালন হয়নি)।

কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের রাজনীতি কমবেশি অসাংবিধানিক— সরকার, বিরোধী উভয় পক্ষই 'মৌলিক অধিকার' দেওয়ার ক্ষেত্রে কৃপণ বলে মানুষকে মানবাধিকার দাবী করতে হয় বা রক্ষা করার জন্য আন্দোলন করতে হয়।

আমাদের বিষয় ভাবনার বাইরে কথাগুলো বলা হয়ে গেল এই কারণে যে, সাম্প্রতিক রাজনীতি বঞ্চনা-বৈষম্য জিইয়ে রেখে যে উন্নয়ন প্রাক্টিস করছে আসলে তা 'পলিটিক্স উইথ ব্লাড' যা মানবাধিকার তথা গণতান্ত্রিক অধিকারের (দুটিই অন্তরবস্তুতে একই) তোয়াক্কা করছে না, এর বিরুদ্ধে যাঁরা সোচ্চার হচ্ছেন, তাঁদের 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দেওয়া হচ্ছে, পাল্টা তাঁরা সরকারকে 'ফ্যাসিবাদী' আখ্যা দিচ্ছেন কিন্তু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াইয়ের প্রস্তাবনা যে মানবাধিকার সনদ ও সংবিধানে আছে তার পাঠ তাঁরা নিচ্ছেন না !

নেওয়া উচিত কি না আমরা তা ভাবনা করতে অনুরোধ করব এই পর্যবেক্ষণের নিরিখে যে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বুর্জোয়ারা 'নিরন্তর বৈপ্লবিক পরিবর্তন' অব্যাহত রেখে 'সাম্যবাদের ভূত'-এর বিরুদ্ধে লড়াই জারি রেখেছিল বিপরীতে সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখা রাজনীতি বিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বাস্তববাদী (= ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন-ই বাস্তব) হয়ে ওঠার ফলে তার গতি হারিয়েছে, একুশ শতকের বিশ্বস্বপ্ন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা সেই স্বপ্ন নিয়েই আমরা মানবাধিকার ঘোষণার ৭৫ বছর পালন করব...

কিন্তু মানবাধিকার আক্রান্ত, অন্য ভাষ্যে সংবিধান আক্রান্ত— মানুষের ন্যায়পরায়ণ সমাজভাবনার বিপরীতে বুর্জোয়াদের 'বৈপ্লবিক পরিবর্তন'-এর কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। আমরা এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে বাস করছি... আমাদের মগজ আক্রান্ত—

আসুন কথা বলা যাক!

তথ্যানুসন্ধান ১

রক্ষক যেখানে ভক্ষক: ডিউটিরত বি এস এফ কনস্টেবল ও এ এস আই কর্তৃক গৃহবধূর ধর্ষণের ঘটনার অনুসন্ধান রিপোর্ট।

গত ২৫ শে আগস্ট ২০২২ মধ্যরাত্রে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পুলিশ জেলার অন্তর্গত বাগদা হেলেঞ্চা পুলিশ থানার জিতপুর গ্রামের ঘটনা।

জিতপুর মাঝারি সাইজের গ্রাম প্রায় ২৮০ ঘর মানুষের বাস। অধিকাংশই কৃষিজীবী মানুষ ।গ্রামটি রনঘাট পঞ্চায়েতের অধীন। এই গ্রামে রয়েছে প্রাইমারি স্কুল। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য সংলগ্ন কাশীপুর গ্রামে আর উচ্চ মাধ্যমিক হেলাঞ্চা গিয়ে পড়তে হয় । জিতপুরের বিস্তীর্ণ পূর্বদিকে বাংলাদেশ সীমান্তকে ভাগ করেছে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে। জিতপুরে বিএসএফ (BSF) ক্যাম্প রয়েছে যাকে জিতপুর বিওপি (Border Out Post) বলা হয়। পাহারায় রয়েছে ৬৮ নম্বর বি এন ব্যাটেলিয়ান। এ অঞ্চলে বিএসএফ হেডকোয়াটার দত্তফুলিয়ার কাছে রনঘাটে।

১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ এপিডিআর এর একটি তথ্যানুসন্ধানী দল ওই এলাকায় যায় এবং সারাদিন ধরে বিভিন্ন মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেন ও তথ্য সংগ্রহ করেন। গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তের অধিবাসীদের সঙ্গে, গ্রামের ক্লাবের যুবকদের সাথে, মহিলাদের সাথে এবং ঘটনাস্থলে কর্মরত মানুষদের সাথে দেখা করা হয় ও কথা বলা হয়। জিতপুর বিওপির ইনচার্জ প্রভাত সিং এবং সুনীল সিং সহ আরো কয়েকজন নাম জানাতে অনিচ্ছুক কনস্টেবলের সাথে। দেখা করা হয় বাগদা হেলাঞ্চা থানার ওসির সাথে এবং ওই এলাকার বিএসএফ এর হেডকোয়ার্টার্স রণঘাটের বিএসএফ কর্তাদের সাথে।

সংগৃহীত তথ্য

বসিরহাটের গৃহবধূ হালিমা (নাম পরিবর্তন) তার স্বামী ও দুই পুত্র কন্যাকে নিয়ে মধ্যরাতে দালালের সহযোগিতায় বাংলাদেশ যাবার প্রচেষ্টা নেয় জিতপুর সীমানা দিয়ে। কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক পরিকল্পনা সফল হয়নি। মা ও মেয়ে বিএসএফের কনস্টেবল আলতাব হোসেন এবং এএসআই এস পি চারোর হাতে ধরা পড়ে এবং স্বামী ও পুত্র সন্তান থেকে আলাদা হয়ে যায়।

ধরার পরে হালিমা কনস্টেবল আলতাব হোসেন এবং এস পি চারোর কাছে কান্নাকাটি করে।তাদের ছেড়ে দিতে প্রার্থনা করে। এএসআই চারো বলে যে তাদের কাজ শেষ হলে তাকে

ছেড়ে দেবে এবং এ এস আই চারোর নির্দেশে হালিমা আর তার মেয়েকে বর্ডার সংলগ্ন একটি কলাবাগানে নিয়ে যাওয়া হয়। এএসআই চারো হালিমার সাত বছরের মেয়েটিকে আটকে রাখে এবং আলতাব হোসেন হালিমাকে ধর্ষণ করে। ছেড়ে দেওয়ার আগে ইন্সপেক্টর চারো হালিমাকে হুমকি দিয়ে বলে যে এই ঘটনার কথা কাউকে যেন না বলে। বললে তাকে পুনরায় গ্রেফতার করা হবে।

এরপর ওই অন্ধকার রাত্রে ৮-৯ কিলোমিটার হেঁটে মা এবং মেয়ে মালঞ্চে পৌঁছোয়। সারারাত বসে থাকার পর সকালে দুই একজন সঙ্গী সাথী জোগাড় করে থানায় যায় এবং একটি লিখিত অভিযোগ ওসির হাতে জমা দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত থানা একটি কেস স্টার্ট করে যার নম্বর ৬৫৮/২২ তাং ২৬/০৮/২২: ৩৭৬ডি এবং৩৭৬(২) সি, আই,পি,সি। ঘটনাটি বিএসএফ ক্যাম্পেও জানাজানি হয় থানা বিওপি ক্যাম্পে যোগাযোগ করে এবং বিএসএফের পক্ষ থেকে কনস্টেবল আলতাব হোসেন এবং এস পি চারোকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ওইদিনই মহিলার মেডিকেল পরীক্ষা করানো হয় এবং বিএসএফের ওই দুজনকে বনগাঁ কোর্টে প্রডিউ করা হয়। পুলিশ কর্তৃপক্ষ সাত দিনের পুলিশ রিমাইন্ড চায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। বনগাঁ আদালত তা মঞ্জুর করেন। থানা মহিলা শিশু কল্যাণ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে। মা ও মেয়েকে বসিরহাটে তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে দেয়। পুলিশ হালিমাকে দিয়ে ১৬৪ সিআরপিসি মোতাবেক গোপন জবানবন্দী চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে রেকর্ডও করায়।

তথ্যানুসন্ধানী দলের পর্যবেক্ষণ

প্রতিদিনই এই এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে যাতায়াত করে বেশকিছু মানুষ অর্থের বিনিময়ে দালাল, বিএসএফ এবং বিডিআর এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় ।এলাকার মানুষের অভিজ্ঞতা তাই। কখনো সখনো মানুষ ধরাও পড়ে যেমন হালিমা ও তার ৭ বছরের বাচ্চা মেয়ে ধরা পড়ল ২৫ শে আগস্টে ।

১৯৭১ সালে ইন্দিরা ও মুজিবুর রহমান ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত প্রশ্নে কতগুলি নীতি নির্ধারণ করে। ১৯৪৯ এর জেনেভা কনভেনশন মেনে সীমান্ত বরাবর জিরো পয়েন্টের উপর পিলার স্থাপন করে। পিলার থেকে উভয় দেশ প্রকৃত সীমানার ১৫০ গজের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করবে বলে চুক্তিবদ্ধ হয়।

ভারত কিন্তু ১৫০ গজের আবশ্যিক শর্ত অমান্য করে এবং দেখা গিয়েছে যে বহুলাংশে কাঁটাতারের বেড়া প্রকৃত সীমার থেকে বেশ কয় কিলোমিটার দুরে পাতা হয়েছে।অনেক ক্ষেত্রে কাঁটাতারের বেড়া গ্রামের ভীতর দিয়ে, গ্রামকে দুটুকরা করে চলে গিয়েছে। ফলস্বরুপ গ্রামের লোকেদের প্রচুর ঘরবাড়ি ও চাষের জমি কাঁটাতারের ওপারে রয়েছে। ওই জমিতে বসবাসকারীদের এবং চাষীদের প্রচুর সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়। জীবন পুরোটা বিএসএফের খামখেয়ালীপনা ও মর্জীর উপরে নির্ভরশীল।

৪০৯৬ কিমি দীর্ঘ ভারত - বাংলাদেশ সীমা বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম আন্তর্জাতিক স্থল সীমান্ত, যার অর্ধেকের থেকে একটু বেশী প্রায় ২২১৭ কিমি পড়ে পশ্চিমবঙ্গে। সময়ের সাথে সাথে সীমার সুরক্ষার নামে, মানুষের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণের নামে সীমা কে বেশী বেশী করে সশক্তিকরণ করা হয়েছে। প্রহরায় এসেছে নানান বাহিনী যারা সীমা সুরক্ষার নামে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় থাকা মানুষের জীবনযাপনকে নানাভাবে বিঘ্নিত করে চলেছে। যেমন হয়েছে উত্তর ২৪ পারগানার জিতপুর গ্রামে।

কেবলমাত্র জিতপুর গ্রামের চাষীদেরই প্রায় ৫০০ বিঘা জমি কাঁটাতারের ওপারে রয়েছে ওই জমি চাষ করার ক্ষেত্রেও কৃষকদের নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই জমিতে যাওয়ার জন্য রয়েছে দুটি গেট যা খোলার কথা সকাল ছটায়। কোনোদিনই গেট কিন্তু ছটায় খোলা হয় না। ঘন্টা দুঘন্টা দেরী সাধারণ ব্যাপার। গরমে চাষীরা কাকভোরে মাঠে কাজ করে। জিতপুরের চাষীদের তা করার উপায় নেই। তারা প্রচুর অনুরোধ করেছেন প্রশাসন ও বিএসএফএর নানা স্তরে কিন্তু কোনো সুরাহা হয় নি। ফেরার সময় কিন্তু বিকেল পাঁচটায় বাঁধা। তার কোনো নড়চড় নেই। কাজ অসমাপ্ত রেখেই বেরিয়ে যেতে হবে। সামান্য দুপাঁচ মিনিটের হেরফের হলে বিএসএফের চোখরাঙ্গানি ও নানানবিধ হুমকির মধ্যে পড়তে হয়। রাতে থাকার অনুমতি নেই। এর মধ্যে দুপুর ১১ টা থেকে ৩টে অবধি জওয়ানদের মধ্যান্নভোজনের বিরতিতে গেট বন্ধ থাকে। যে যে দিকে আছে তাকে সেদিকেই থাকতে হয়। অসুস্থ বোধ করলে কোনো রকম সঙ্কট অথবা জরুরী প্রয়োজনেও বেড়া পেরোবার উপায় নেই।

গেট দিয়ে ঢোকার সময় BSF চাষীদের আধার কার্ড আর না হলে ভোটার কার্ড জমা নেয়। খাতায় লিখে সই করে অথবা বুড়ো অঙুলের ছাপ নিয়ে কাঁটাতারের ওপারে তাদের নিজেদের জমিতে চাষ করার অনুমতি দেয়। এরপরেও অনেক সময়ে চাষী খেতে পৌঁছোতে পারেনা। BSF জওয়ানরা তাদের দিয়ে সার্ভিস রোডের ঝাড় জাঞ্জাল পরিষ্কার করিয়ে নেয়। ফলে তাদের কাজের সময় খেয়ে নেয়। কোনো

কোনো সময় তাদের ক্যাম্পের কাজও করে দিতে হয়।প্রচন্ড অসহায় অবস্থায় জীবনযাপন করতে হয় কৃষিকর্মে নিযুক্ত গ্রামবাসীদের। সুবিধামতো নিজের জমিতে কাজ না করতে পাওয়ার বিবশতা কেউ বুঝছে না। কাঁটাতারের ওপারের জমি যেন গলার কাঁটা। ভাল করে চাষ করারও উপায় নেই আবার বিক্রী যে করবে তারও গ্রাহক নেই। কে কিনবে এই বিকল জমি।

মজার ব্যাপার জানা গেল যে বিএসএফ ক্যাম্পের খাতা, কলম, কালির প্যাড ইত্যাদি সবকিছু গ্রামবাসীদের কিনে দিতে হয়। না দিলে অথবা ফুরিয়ে গেলে গেট বন্ধ। আর কাঁটাতারের ওপারে যাওয়া যাবেনা। BSF এর কাছে এই সাধারণ দ্রব্যাদি বাবদ কি কিছুই অর্থ বরাদ্দ নেই নাকি এটাই তাদের উপঢৌকন ? BSF এর ক্ষমতা এতটাই যে তারা যখন তখন মাইকে ঘোষণা করে এলাকায় ১৪৪ ধারা লাগিয়ে দিতে পারে। গ্রামের লোকেদের তাদের তোয়াজ করে চলতে হয়। তালাশির নামে তারা অনায়াসে বাড়ি ঢুকে সমস্ত লন্ডভন্ড করে বেরিয়ে যেতে পারে। অ্যারেস্টও করতে পারে। মেয়েরা সামাজিক লজ্জায় হেনস্তার অভিযোগ করে না। তবে তাদেরও যে BSFএর হাতে যৌন হেনস্তার শিকার হতে হয় কেউই তা অস্বীকার করেনি। গ্রামের মানুষের কথা অনুযায়ী চোরাচালান এই এলাকার এক বিকল্প অর্থনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জিতপুর বিওপিরের ইনচার্জ অথবা অন্য ডিউটিরত কনস্টেবল কথা বলতে রাজি হয় নি। আবার বিওপিতে দেখা গেল কিছু বন্দুক হাতে উর্দীধারী জওয়ান যাদের উর্দীতে তাদের নামের ব্যাজ নেই। ব্যাজ নেই কেন তার উত্তর তারা দিলেন না আবার নামও বললেন না। আর একজন সাদা ড্রেসে ব্যক্তিকে মনে হল বড় আফিসার, বোধ হয় হেডকোয়ার্টার্স রণঘাট থেকে এসেছিলেন তিনি বেশ মহড়া করে এসে বসে থাকলেন, কিন্তু কোনো প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। এমন কি তিনি কে, কি পদ, কোথায় পোস্টিং, কনস্টেবল আলতাব হোসেন এবং এস পি চারোর বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, বিভাগীয় তদন্ত হচ্ছে কি না ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর তো দেনই নি বরঞ্চ পা দোলাতে থাকলেন।

হেলেঞ্চা পুলিশ থানার ওসিও তাদের কাজকর্মে BSF এর হস্তক্ষেপের আক্ষেপ করে। তার অনুসারে, কিছু কিছু কাজ অর্থাৎ রেড এবং অ্যারেস্ট তারা যৌথভাবে করে আবার অনেকসময়েই BSF একক রেড করে। এক্তিয়ার অথবা অধিকার ক্ষেত্রের সঙ্ঘাত চির বিদ্যমান। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সাথে সমন্বয় না করে বিএসএফ ইচ্ছেমতো সার্চ ও ধরপাকড় ইত্যাদি করে থাকে।

বিগত বছরের অক্টোবর মাস থেকে বিএসএফের অপারেশন এরিয়া ১৫ কিমি থেকে ৫০ কিমি বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন এলাকার মানুষ ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। সার্চ, অ্যারেস্ট আর ধরপাকড়ের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছেনা তার কি গ্যারান্টি আছে?

তথ্যানুসন্ধানী দল:

নিশা বিশ্বাস, এপিডিআর যাদবপুর - বাঘাযতীন শাখা

সুরজিৎ, এপিডিআর চাঁদপারা শাখা

তাপস চক্রবর্তী ও কিশোর সিংহ রায়, এপিডিআর কৃষ্ণনগর শাখা

তথ্যানুসন্ধান ২

মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে হার মানিয়ে থানারপাড়া থানায় ফ্যানে ঝুলিয়ে অত্যাচার করা হল গ্রামের শিক্ষাকর্মীর দাদাকে :-

গত 29/09/22 থানারপাড়া থানায় ফ্যানে ঝুলিয়ে একঘন্টাব্যাপী (দুপুর তিনটে থেকে চারটে) বেত দিয়ে মারা হয় গ্রামের সারব্যবসায়ী আলমগীর ইসলামকে । পুলিশি অত্যাচারের ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পরলে তাকে জেলার শক্তিনগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । ঘটনাটি জানতে পারার পর এপিডিআর কৃষ্ণনগর শাখার পক্ষ থেকে একটি তথ্যানুসন্ধান করা হয় । তথ্যানুসন্ধানে আলমগীর ইসলাম জানান , তার ভাই , জাহাঙ্গীর হোসেন মন্ডল ,স্থানীয় নারায়নপুর হাইস্কুলে কেরানী পদে চাকুরিরত । ঐদিন অর্থাৎ 29/09 বৃহস্পতিবার দুপুরবেলা তার ভাই এর স্কুলে কাজের অতিরিক্ত চাপ ছিল । ভাইয়ের কাজে বাহ্যিক সাহায্য করার জন্য বড় ভাই আলমগীর তার ছেলেকে পাঠান ঐ স্কুলে । এই নিয়ে একই স্কুলের অপর কেরানী(হিটলার আলি মন্ডল) আপত্তি জানান এবং জাহাঙ্গীরকে মারতে শুরু করে। ভাইপো বাঁচাতে চাইলেও ব্যর্থ হয় । ইতিমধ্যে হিটলার আলি মন্ডল গ্রামের প্রধান মিঠু সাহাকে ফোন করে । কয়েকমিনিটের মধ্যে গ্রামপ্রধান মিঠু সাহা একটি স্করপিও গাড়িতে দশ / বারোজন সহ নারায়নপুর হাইস্কুলের সামনে হাজির হয় । প্রসঙ্গত , মিঠু সাহা এবং তার সাথে আসা সহযোগীরা প্রত্যেকেই সশস্ত্র অবস্থায় ছিল । পরিস্থিতি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পরেন জাহাঙ্গীর আলমের ভাইপো , কাকাকে মেরে ফেলতে পারে এই কথা জানিয়ে সে তার বাবা আলমগীর আলমকে ফোনে ডাকে । আলমগীর তখন কলাবাগানে কাজ করলেও বিপদ বুঝে কিছুক্ষণের মধ্যেই স্কুলে চলে আসেন । বচসা শুরু হয় গ্রামপ্রধান মিঠু সাহা ও তার সশস্ত্র বাহিনীর সাথে । ভাইকে মারার বিরোধীতা করলে গ্রামপ্রধানের বাহিনী আলমগীরের

ওপর চড়াও হয় । সেইসময় থানারপাড়া থানা থেকে পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে । থানার মেজবাবুর সামনেই মিঠু সাহার সাথে আসা অ্যালেক্স , অ্যাটলাস, মাফিজুল , সামিন ও তাকে মারতে থাকে ও প্রাণে মারার হুমকি দেয়। এই অবস্থায় মেজবাবু তাকে বলেন এখানে তিনি নিরাপদ নন। তাই তাকে পুলিশের গাড়িতেই থানায় যেতে বলেন । আলমগীরের বাইক নিয়ে জাহাঙ্গীর ও তার ভাইপো ঘটনাস্থল থেকে চলে যান এবং আলমগীর পুলিশের গাড়িতে করে থানারপাড়া থানায় আসেন গ্রামপ্রধানের গুন্ডাবাহিনী থেকে নিরাপত্তা পাওয়ার আশায়। কিন্তু থানায় আসার পর শুরু হয় আরেকদফা অত্যাচার । থানার বড়বাবু, অভ্র বিশ্বাস তাকে প্রথমে ধমকাতে থাকেন এই বলে যে "বড় মাস্তান বনেছিস আজকাল!" আলমগীর ইসলাম পেশায় ব্যবসায়ী । এছাড়াও নিজের জমিতে সামান্য চাষবাস ও করেন ।তাদের পারিবারিক ব্যবসাও আছে । কিন্তু কোনো সক্রিয় রাজনীতির সাথে তিনি কোনোদিন ই যুক্ত ছিলেননা বলে জানান । এলাকায় তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ ও নেই । তা স্বত্ত্বেও তিনি " মাস্তান' কি করে হয়ে গেলেন এই প্রশ্ন ঐ থানার বড়বাবুকে করলে বড়বাবু সিভিক পুলিশদের বলেন সিলিং ফ্যানের সাথে তাকে ঝোলাতে । থানারপাড়া থানার বড়বাবু , অভ্র বিশ্বাসের আদেশমতো আলমগীর ইসলামের দেহ ঝুলিয়ে দেওয়া হয় সিলিং ফ্যানের সাথে ।তারপর শুরু হয় নির্যাতনের শেষ পর্যায় ! বেত দিয়ে তিনজন সিভিক পুলিশ (আমজাদ, বাপি, আসলাম) তার পায়ে মারতে থাকে । আর বড়বাবু দায়িত্ব নেন দেহের সংবেদনশীল অঙ্গ সহ অন্যান্য অংশে বেতের আঘাত করতে। থানায় অসুস্থ হয়ে পড়লে তার পরিবার থানা থেকে নিয়ে এসে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করেন ।যেখান থেকে তাকে শক্তিনগর হাসপাতালে রেফার করা হয়।আলমগীর দেখান দেহের নানা অংশে জমাট রক্তের দাগ ! প্রচন্ড যন্ত্রনায় তিনি বর্তমানে হাঁটতে পর্যন্ত পারছেননা । এই ঘটনার বিরোধীতায় তার মা মেহেজান বিবি এস পি , নদীয়াকে অভিযোগ জানান। থানাকে জানানো হলেও এফ আই আর করেনি । তদুপরি পরিবারকে হুমকি দিচ্ছেন থানারপুর থানার ওসি মীমাংসা করে নেওয়ার জন্য ।

প্রশ্ন হল :1) আলমগীর ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই ।তাহলে ওসি কি মীমাংসা করতে চাইছেন ? পুলিশি নির্যাতনের মীমাংসা ? 2) কোন সাহস আর ঔদ্ধত্যের বশে তিনি আলমগীর ইসলামকে অমানুষিক অত্যাচার করতে পারেন? হেফাজত নির্যাতনের মতো ভয়ঙ্কর অপরাধ করার পরেও তিনি হুমকি দিচ্ছেন কি করে?ওসি অভ্র বিশ্বাসের বিরুদ্ধে উর্ধ্বতন প্রশাসন কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা এখন ও নেয়নি কেন? এই বিষয়ে কৃষ্ণনগর শাখার পক্ষ থেকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ জানানো হয় ও তিনটি দাবি রাখা হয় । দাবিগুলি :-1) অভিযুক্ত থানারপাড়া ওসির বিরুদ্ধে তদন্ত করা ও শাস্তি দিতে হবে 2) ঘটনার দিন থানারপাড়া থানায় সি সি টিভি ক্যামেরার ফুটেজ সাপেক্ষে তদন্ত করতে হবে 3) আক্রান্ত আলমগীর ইসলামকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ।জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এই অভিযোগের ভিত্তিতে এস পি নদীয়ার কাছে পনেরো দিনের মধ্যে একটি তদন্ত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে। নদীয়া এস পি এর কাছে হেফাজত নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং ঘটনার তদন্ত দাবি করে শাখার পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয় ।এস পি স্বীকার করেন যে ঐ থানায় হেফাজত নির্যাতন হয়েছে বলে তিনিও মনে করছেন।

তথ্যানুসন্ধানের ধারাবিহকতায় এবং আলমগীর ইসলামদের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত মিঠু সাহা এবং থানার ও সি এর সাথে কথা বলতে কৃষ্ণনগর শাখার পক্ষ থেকে 23/10 ফাজিলনগর ও পিয়ারপুর গ্রাম ও থানারপাড়া থানায় যাওয়া হয়।এইদিনের তথ্যানুসন্ধানে শিকারপুর শাখাও অংশগ্রহণ করে । প্রথমে গ্রামপ্রধান মিঠু সাহার সাথে কথা শুরু হলে তিনি জানান , আলমগীর ইসলামের পরিবার 2011 এর আগে সিপিআইএম এর হার্মাদ বাহিনীর সাথে যুক্ত ছিল এবং গ্রামে সন্ত্রাস চালাত ।তাদের অত্যাচারকে মোকাবিলা করতেই মিঠু সাহা এবং তার বর্তমান সহকর্মীরা জনযুদ্ধ গোষ্ঠীতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন । এবং জনযুদ্ধ গোষ্ঠীতে সক্রিয় থাকার কারণে তিনি জেলেও ছিলেন ।জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ও ক্ষমতার পালাবদলের পর তিনি তার সহকর্মীরা তৃণমূলে যোগদান করেন । তিনি জানান , স্কুলে গন্ডগোলের দিন পুলিশের সামনেই আলমগীর ইসলাম হেঁসো দিয়ে হিটলারের এক বন্ধুকে(মিঠু সাহার দলের লোক) আক্রমণ করতে আসে যাতে তার নাকের কাছে কিছু টা কেটেও যায় ।এই অবস্থায় মিঠু সাহা উপস্থিত থানারপাড়া থানার ওসিকে বলেন আলমগীরকে অ্যারেষ্ট করতে ও আইনী ব্যবস্থা নিতে ওসিকে আলমগীরকে গ্রেফতার না করে থানারপাড়া থানায় আটক করেন। থানায় যে আলমগীরকে অত্যাচার করা হয় এই প্রসঙ্গে মিঠু সাহা বলেন আটককৃত ব্যক্তিকে' দু চার ঘা' ওসি দিয়েছে তা স্বীকার করে নিয়েই বলেন এটা আইন বহির্ভূত হলেও এটা সাধারণত হয়েই থাকে । অর্থাৎ হেফাজত নির্যাতন যে থানাতে ঘটেই থাকে একথা গ্রামপ্রধান মিঠু সাহা স্বীকার করেন । 15 ই অক্টোবর আলমগীরদের বাড়িতে আক্রমণ ও গুলিচলনার ঘটনায় তার বক্তব্য এই ছিল যে , আলমগীরের ভাই রাহুল মন্ডল নিজেদের

পক্ষে গ্রামবাসীদের সমর্থন জোগাড় করতে একটি গণস্বাক্ষর তালিকা তৈরি করেন । এই গণস্বাক্ষর তালিকা নদীয়া এস পি তদন্তের ভার দেন সি আই ও এস ডি ও কে । তদন্ত করতে গিয়ে দেখা যায় যে গণস্বাক্ষরে সই করা এমন বেশ কিছু নাম আছে যারা জানতেন ই না তাদের নাম ঐ তালিকায় আছে ।অর্থাৎ স্বাক্ষরকারীদের সম্মতি নিরপেক্ষ রেখেই ঐ গণস্বাক্ষর করানো হয় যা ভুয়ো । এই অভিযোগ পরবর্তীতে আলমগীর ইসলামের আত্মীয়রা স্বীকার করে নেন । এই গণস্বাক্ষর নিয়েই দ্বিতীয়দিনের গন্ডগোলের সূত্রপাত হয় । যাদের সম্মতি ব্যতিরেকেই গণস্বাক্ষর করানো হয় তারা আলমগীরের বাড়িতে রাত দশটা নাগাদ চড়াও হয় এবং আক্রমণ করে । শুরু হয় বচসা ও পারস্পরিক আক্রমণ । চলে গুলিও ।পায়ের পাতাতে গুলি লেগে আহত হন হাসিবুল মন্ডল ।যিনি বর্তমানে বহরমপুর হাসপাতালে ভর্তি । এই ঘটনায় থানারপাড়া থানার পুলিশ আসে এবং ঐ পরিবারের নয়জনকে গ্রেফতার করে । গুলি কারা করেছিল এবং অস্ত্র কার কাছে ছিল এই প্রসঙ্গে মিঠু সাহা জানান অস্ত্র সইফুল মন্ডল, পিন্টু মন্ডল এবং রাহুল মন্ডলের কাছে থাকার সম্ভাবনা ছিল । আলমগীরের পরিবার অভিযোগ করেন যারা আক্রমণ করতে এসেছিল (সইফুল মন্ডল, হাফিফুর রহমান মন্ডল, জুবের বিশ্বাস ও হাসিবুল মন্ডল) তারাই অস্ত্র নিয়ে এসেছিল । প্রসঙ্গত , আলোচনার শুরুতেই মিঠু সাহা আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে মৌতুলি নাগ সরকার মিডিয়ার কাছে আলমগীর ইসলাম ও তার পরিবারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব রেখেই মন্তব্য করেন । মৌতুলি জানান, শাখার কাছে আলমগীর ইসলামের মা মেহেজান বিবির লিখিত অভিযোগ আসে এবং হাসপাতালে শাখার পক্ষ থেকে মৌতুলি ও ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জী আলমগীরকে দেখতে গেলে সেই অভিযোগের সত্যতাও দেখতে পান ।এরপরে পুলিশি হেফাজতে নির্যাতনের বিরোধীতা করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় ছিলনা । পরে যদিও তিনি হেফাজত নির্যাতনের সত্যতা স্বীকার করেন সাথে একথাও বলেন যে , আলমগীরের পরিবার তাদের অভিযোগ অনতিবিলম্বে প্রত্যাহার করে নেবেন। সেটা শুধু সময়ের অপেক্ষামাত্র। এরপর আমরা পিয়ারপুর গ্রামে কিছু গ্রামবাসীর সাথে কথা বলতে চাই । তারা জানান ঘটনার সময় তারা কেউই উপস্থিত ছিলেননা তাই আসলেই কি ঘটেছিল তা তাদের জানা নেই ।তারাই আমাদের আলমগীরের বাড়ি চিনিয়ে দেন যদিও সেই বাড়িতে কেউ না থাকায় কারোর সাথেই কথা বলা সম্ভব ছিলনা।আমরা চলে যাই, আলমগীরের জেঠুর বাড়ি এবং ঘটনার বৃত্তান্ত জানতে চাই । আলমগীরের জেঠুও এই ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন এবং বর্তমানে তেহট্ট সাব জেলে বন্দী রয়েছেন । আশ্চর্য্যজনকভাবে আলমগীরের জেঠুর মেয়ে পিঙ্কি মন্ডল জানান , পুলিশের বিরুদ্ধে তাদের কোনো অভিযোগ নেই ।একই কথা জানান উপস্থিত পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও । কিন্তু পুলিশ তার বাবা ও চাচা চাচিদের বিরুদ্ধে হত্যার চেষ্টা ও অস্ত্র আইনে অভিযুক্ত করেছে সেক্ষেত্রে কি এই অভিযোগ সত্যি ? এই প্রশ্ন করলে তারা বলেন , এই অভিযোগ মিথ্যা এবং পুলিশকে এটা মিঠু সাহার লোকেরা করিয়েছে ।ঘটনাটা সম্পূর্নত ই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এমনটাই জানান তারা । তাদের এই বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছিল মিঠু সাহার যে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন সেই অপেক্ষার হয়ত আর কোনো প্রয়োজন নেই , হয়ত পুলিশের সাথে একপ্রকার সমঝোতা যথারীতি হয়েই গেছে ! পিয়ারপুর গ্রাম ছেড়ে থানারপাড়া থানার উদ্দেশ্যে আমরা রওনা দিই । থানায় ওসি ছিলেননা এবং তার সাথে যোগাযোগ করে আমাদের যাওয়ার কথা জানানোয় ওসি আমাদের অপেক্ষা করতে বলেন। আমরা বাইরে অপেক্ষা করতে থাকি এমন সময় মৌতুলির কাছে রাহুল মন্ডলের ফোন আসে এবং তিনি জানান , থানারপাড়া থানার ওসির সাথে তাদের একটা আপোস হয়েছে এবং ওসি বলেছেন ‘বেশি বাড়াবাড়ি করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে’। রাহুল আমাদের অনুরোধ করেন , এই বিষয়ে পুলিশের সাথে ‘ঝামেলা’ না করতে । থানারপাড়া থানার ওসির সাথে দেখা করতে যান অমিতাভ সেনগুপ্ত ও শিকারপুর শাখার সমীরন বিশ্বাস , প্রশান্ত দাস ও বিভাস মন্ডল ।

এরপর,থানারপাড়া থানায় ওসি অভ্র বিশ্বাস জানান , পুলিশের সামনে অস্ত্র হাতে অন্য এক জনকে আক্রমণ করায় আলমগীরকে তিনি পুলিশ হেফাজতে নেন। তিনি এও দাবি করেন যে , হেফাজতে থাকাকালীন কোনওরকম অত্যাচার আলমগীরকে করা হয়নি।

এরপর CI থানায় আসেন। তিনিই মূলতঃ দায়িত্ব নিয়ে কথা বলতে থাকেন, তার দাবি APDR তার নিজের মতো করে যে ভাবে ঘটনার তদন্ত ও করছে নিশ্চয়ই করুক,শুধু সংঘর্ষের পরিস্থিতি (15/10/22 রাত্রের ঘটনা উল্লেখ করে) তে পুলিশের আত্মরক্ষার অধিকার আছে এই বিষয়টিও দেখুক।এবং অভিযোগ করেন আলমগীরদের পরিবারের বক্তব্য কে অগ্রাধিকার দেওয়ার আগে প্রশাসনের কাছে খোঁজ নেওয়া উচিৎ ছিল । তিনি বলেন, আলমগীরের পরিবার দীর্ঘদিন নানা অপরাধে (বেআইনি ইঁটভাঁটা,মাটি কাটা সহ অন্যান্য ব্যবসা) যুক্ত থাকার বিষয়ে।কৃষ্ণনগর শাখা পক্ষ থেকে অমিতাভ জানান , আমাদের মূল অভিযোগ পুলিশি হেফাজতে নির্যাতন নিয়েএবং তার সপক্ষে আলমগীর শক্তিনগর হাসপাতালে ভর্তি থাকা কালীন আমাদের চাক্ষুষ

অভিজ্ঞতাই আমাদের কাছে মূল বিবেচ্য হয়েছে (যার ছবি নদীয়ার SP কে ও পাঠানো হয়েছে)।

APDR হেফাজতে অত্যাচার ও পুলিশি তদন্তে আইন ভাঙা নিয়ে এই ক্ষেত্রেও তার বরাবরের অনমনীয় অবস্থান ই রাখবে। OC র কাছ থেকে 29/9 ও 15/10এর ঘটনায় দাখিল হওয়া নানা কেস/FIR নম্বর ও সংশ্লিষ্ট ধারা গুলি চেয়ে নেওয়া হয়।

আমাদের পর্যবেক্ষণ : সংবাদপত্রে থানার পাড়া থানায় হেফাজত নির্যাতনের খবর জানতে পেরেই আমরা এই তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজনীতা অনুধাবন করি । এবং শক্তিনগর হাসপাতালে আলমগীর ইসলামের মা মেহেজান বিবির অভিযোগ ও তার সত্যতা চাক্ষুষ করি আলমগীরকে দেখেই। এক্ষেত্রে থানারপাড়া থানার ওসির দাবি অনুযায়ী যদি একথা মেনেও নেওয়া হয় যে,পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন আলমগীরের প্রতি কোনো রকম নির্যাতন হয়নি সেক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে , নারায়নপুর স্কুলের সামনে থেকে ওসি আলমগীরকে ঐ থানায় নিয়ে যাওয়ার পর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় যেখানকার মেডিকেল রিপোর্টে আলমগীর এর ওপর শারীরিক নির্যাতন হয়েছে বলে জানানো হয়। স্কুল থেকে থানা এবং থানা থেকে হাসপাতাল - এই সময়কালে আলমগীর অন্য কোথাও ছিলেন না অথবা কোনো সংঘর্ষেও জড়াননি ।তাহলে এই দুই স্থানের সাধারন স্থল থানা ছাড়া এই নির্যাতন কোথায় ঘটল ? থানারপাড়া থানার ওসি এবং নদীয়া জেলা প্রশাসনকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে । যদিও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে ঐ দিনের অন স্পট তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে । কিন্তু যদি সি সি ক্যামেরার এক্তিয়ারবর্হিভুক্ত থানার ই কোনো স্থানে রেখে তার ওপর অত্যাচার চালানো হয়ে থাকে তাহলে কি তা হেফাজত নির্যাতন বলে স্বীকৃত হবেনা?

দ্বিতীয়ত : নদীয়া জেলায় একাধিক পুলিশি হেফাজতে নির্যাতনের ঘটনা ঘটলেও (এমনকি মামলা হলেও) শাখার তত্ত্বাবধানে থাকা সবকটি ঘটনার ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে আক্রান্তের পরিবার প্রাথমিকভাবে অভিযোগ করলেও পরবর্তীতে পুলিশের সাথে আপোস করে নিচ্ছেন । আলমগীরের ঘটনায় মামলা প্রত্যাহার অব্দি করবেন বলে জানিয়েছেন তার পরিবার। এক্ষেত্রে পুলিশ ও আলমগীরের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করে নেবে বলে জানিয়েছে । এক্ষেত্রে সমিতির পক্ষে প্রতিটি ঘটনার পক্ষেই অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের শাস্তির পক্ষে অটল থাকা সম্ভব হচ্ছেনা । কোথাও কাজ করছে পুলিশের ভয় তো কোথাও কাজ করছে পুলিশের পক্ষ থেকে বড় অঙ্কের প্রলোভন (ভীমপুর থানা)। এই বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে একাধিক অভিযোগ দায়ের করার পরেও প্রশ্ন থাকছে :- সুবিচার পাবে কে যখন অভিযোগকারী নিজেই আপোসের পথ বেছে নেন? বিষয়টি পত্রিকার মাধ্যমে সকল সদস্যের কাছে রাখছি এই প্রত্যাশায় যদি কোনো উপায়ে এই সমস্যার সমাধানসূত্র মেলে ।

তথ্যানুসন্ধান ও এস পি ডেপুটেশনে শাখার পক্ষ থেকে যারা ছিলেন :- তাপস চক্রবর্তী, মৌতুলি নাগ সরকার, অমিতাভ সেনগুপ্ত, ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জী এবং শিকারপুর শাখার পক্ষ থেকে ছিলেন সমীরন বিশ্বাস , প্রশান্ত দাস ও বিভাস মন্ডল ।

তথ্যানুসন্ধান ৩

রাতের অন্ধকারে পুলিশের কড়া নাড়া:একটি তথ্যানুসন্ধান।

গত ৬ই নভেম্বর ২০২২, ঘটনার তথ্যানুসন্ধানে এপিডিআর এর ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল দত্তপুকুরের অধিবাসী পলাশ ভদ্রের বাড়িতে যাই।বাড়িতে উপস্থিত পলাশ বাবু এবং মহুয়া ভদ্রের কাছে ঘটনাটির অনুপুঙ্খ বিবরণ জানতে চাই ও তা লিপিবদ্ধ করি।

“পলাশের বাড়ি দত্তপুকুর

আমিনুল থাকে বেকবাগান”

---------- কবীর সুমন (১৯৯২)

১৯৯২ সালের ৭ ডিসেম্বর এক থিয়েটার ওয়ার্কশপে পলাশ ভদ্র এবং আমিনুল হকের দেখা হওয়ার কথা।

৬ ডিসেম্বর হিন্দুত্ববাদীদের বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কারণে সারাদেশে অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়। এ রাজ্যে ও সেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে আমিনুল বেক বাগান থেকে আসতে পারেননি, ওই থিয়েটার ওয়ার্কশপে। ব্যাকুল হয়ে পলাশ ভদ্র ফোন করেছিলেন বন্ধু কবীর সুমনকে (তখন অবশ্য সুমন চট্টোপাধ্যায়ের নামে পরিচিত ছিলেন)। সেই পলাশ-আমিনুলদের নিয়ে সুমন গান লিখে ফেলেন। পলাশ ভদ্র তখন সরকারি চাকুরে এবং থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার স্ত্রী মহুয়া ভদ্র ও ‘নৈহাটি ব্রাত্য জন’ এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

তারপর গঙ্গা দিয়ে বহু জল বয়ে যায়, বয়স বাড়ে পলাশবাবুর। এখন ৬৩, সুগার-স্পন্ডেলাইসিস সহ নানান রোগে জর্জরিত। মহুয়া দেবীও থিয়েটার ছাড়তে বাধ্য হন, বয়স ও রোগের কারণে। বাইরে বেরোতে পারেন না নিঃসন্তান এই দম্পতি, প্রায় একরকম গৃহবন্দি বলা চলে।

তাই ফ্রেঞ্চ ভাষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ ডিগ্রিধারী পলাশবাবু বাড়িতে বসেই পড়াশোনা এবং অনুবাদ সাহিত্যে মনোনিবেশ করেন। আনন্দ পাবলিশার্স সহ বহু প্রকাশনা সংস্থা থেকে তা প্রকাশিত হয়।

অনুসন্ধান

পলাশ বাবু ও মহুয়া দেবী জানান "গত ৩১ শে অক্টোবর(২০২২) রাত ৮টা নাগাদ ৬ জন লোক দত্তপুকুর স্টেশন সংলগ্ন, হসপিটাল রোডের, পলাশ ভদ্রের বাড়িতে কড়া নাড়তে থাকেন। ডাকাডাকির কারণে স্ত্রী মহুয়া ভদ্র নিচে নেমে দরজার কাছে এলে ,তাঁরা জানান, লালবাজার সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছেন , পলাশবাবুর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলবেন। হতচকিত হয়ে মহুয়া দেবী স্বামী পলাশবাবুকে নিচে ডাকেন। অসুস্থ পলাশবাবু(৬৩ বছর)অতি কষ্টে নিচে নেমে এলে তারা(ঐ ছয়জন) ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে চান। প্রাক্তন সরকারি চাকুরে পলাশ বাবু তাদের ঘরে ঢোকার অনুমতি দেন। ঘড়িতে বাজে তখন রাত আটটা! পলাশবাবু এবং মহুয়া দেবী বারংবার অভিযোগ এবং অভিযোগকারীর কথা জিজ্ঞেস করলে তারা এড়িয়ে যেতে থাকেন। এক সময় তাঁদের একজন বলেন 'এক নাবালিকাকে টুইটার হ্যান্ডেল থেকে বিরক্ত করার অভিযোগের তদন্ত করতে তাঁরা লাল বাজার সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্ট থেকে এখানে এসেছেন।' পলাশবাবু জানান, তাঁর এক ভাগ্নি তাঁরই নামে টুইটার হ্যান্ডেল খুলে দিলেও তা জীবনে কখনো ব্যবহার করেননি। পলাশবাবু এবং তাঁর স্ত্রীর মোবাইল, ডেস্কটপ সবই ঘেঁটেঘুটে তারা দেখেন এবং তারপর জানান যে, তাদের কোন অভিযোগ নেই! কিন্তু এর পরেও দু'ঘণ্টা ধরে পলাশবাবুর বইয়ের লাইব্রেরী খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখেন। জিজ্ঞেস করেন, কেন এত বই, কেন মার্ক্স লেলিন তলসতয় ডিমিট্রভের বই পড়া? রাত এগারোটা পর্যন্ত এইভাবে চলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ। অবশ্যই কোন অসম্মানজনক কথা না বলে তা ভদ্রভাবেই চলে ।

পলাশবাবুরা আর জানান, সাড়ে তিন ঘন্টা ধরে অজ্ঞাতপরিচয়, লালবাজারের পুলি'শ দাবী করা ঐ বহিরাগতদের উপস্থিতি তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা বা ট্রমা তৈরি করে দিয়েছে। আরও নানা অভিজ্ঞতার কথা জানান। এবং এ বিষয়ে তাদের পক্ষ থেকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অনলাইন অভিযোগ জমা করবেন বলে জানান।

পলাশ বাবুদের বাড়িতে আমাদের অনুসন্ধান শেষ করে , এরপর আমরা দত্তপুকুর থানায় যাই, থানায় ভারপ্রাপ্ত আই,সি না থাকায় থানার মেজো বাবু ইন্সপেক্টর নায়েক আমাদের সাথে কথা বলেন। আমরা মধ্যরাত অবধি পলাশ ভদ্রের বাড়িতে পুলিশ পরিচয়ে অবস্থানকারী আগন্তুকদের সম্পর্কে বিশদে জানতে চাই। প্রথমে না, জানিনা, জানা নেই - এইসব বলতে থাকলেও আমরা বারবার পলাশবাবুর পরিচয় ও তার ঠিকানা, ঘটনার পরের দিন তাদের থানায় রিপোর্ট করার কথা উল্লেখ করা তে তিনি ঘটনার বিষয়ে কথা বলতে রাজি হন। আমরা জানতে চাই, ১) আগন্তুকরা প্রকৃতই পুলিশের লোক কিনা?২)রাত ৮টা থেকে মধ্যরাত্রি১১.৩০টা পর্যন্ত গৃহস্থ বাড়িতে পুলিশের তল্লাশি কেন?৩) লালবাজার সাইবার সেল পরিচয় দিয়ে থানায় কোনো রিপোর্ট করা হয়েছে কিনা? ৪) রিপোর্ট থাকলে সাক্ষরকারী অফিসারের নাম কি?

মেজো বাবু ইন্সপেক্টর নায়েক শুধুমাত্র স্বাক্ষরকারী ইন্সপেক্টর হিসাবে লালবাজার সাইবার সেলের ইনস্পেকটর এ, এস, রায়ের নাম বলেন। এবং তার সাথেই এ ব্যাপারে কথা বলে ঘটনা সবিস্তারে জেনে নিতে বলেন।

আমাদের পর্যবেক্ষণ:

কয়েক মাস আগে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল নাগরিক সমাজকে এবং কয়েক দিন আগে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কলমধারী নাগরিক সমাজকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেছেন!

তবে কি এ -রাজ্যের পুলিশও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মান্যতা দিতেই নাগরিক সমাজের উপর নজরদারি ও সন্ত্রস্ত করার কাজ শুরু করলেন? রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী কি বলেন?

তাহলে আমাদের রাজ্যেও 'রাতে পুলিশের কড়া নাড়া' চলতেই থাকবে?

তথ্যানুসন্ধানী দল : সোমনাথ বসু, আলতাফ আহমেদ, সোমনাথ মুখার্জি, শঙ্কর দাস , বিশ্বজিৎ বিশ্বাস)

তথ্যানুসন্ধান ৪

চাঁদপাড়া শাখার সভাপতি নন্দদুলাল দাসের উপর দুষ্কৃতিদের গুলি

গত ১৮ ই অক্টোবর, ২০২২ চাঁদপাড়া নিবাসী গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির (APDR) বর্তমান সভাপতি নন্দদুলাল দাসের উপর দুষ্কৃতিদের দ্বারা গুলি চালানোর একটি ঘটনা ঘটেছে।

নন্দদুলাল বাবু জানান,, সুঁটিয়া গণধর্ষণ কান্ডে এলাকায় গড়ে ওঠা গণআন্দোলনের অন্যতম মুখ হিসাবে প্রয়াত বরুণ

বিশ্বাস ২০১৪ সালে গাইঘাঁটা স্টেশনে আততায়ীদের গুলিতে নিহত হন। দীর্ঘক্ষন রক্তাক্ত দেহখানি স্টেশনে পড়ে থাকলেও শাসকদলের আশ্রিত দুষ্কৃতিদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। যা তদানিন্তন রাজ্য রাজনীতিতে গভীর ছাপ ফেলে। এই হত্যা কান্ডে শাসকদলের যোগসূত্র প্রকাশ্যে চলে আসে।শুরু হয় বিচারের দাবীতে এলাকাবাসীদের অন্য এক আন্দোলন। সুটিয়া গণধর্ষণ, এলাকায় প্রশাসন ও শাসকদলের মদতপুষ্ট প্রোমোটার-দুষ্কৃতিরাজের বেআইনী নদী ও পুকুর ভরাট, স্কুল ও সরকারি জমিতে প্রমোটার রাজ গড়ে তোলার বিরুদ্ধে নন্দদুলাল ছিলেন বরুণ বিশ্বাসের অন্যতম সহকর্মী। বরুন হত্যা ও সুটিয়া গণধর্ষণ মামলায় নন্দদুলাল অন্যতম সাক্ষী হওয়ায় এবং আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাওয়ায় তিনি হয়ে ওঠেন দুষ্কৃতিদের পথের কাটা।আর তাই নানাসময়ে তাকে বহুবিধ হুমকি ও প্রাণনাশের আশংকা নিয়ে চলতে হচ্ছিল।

প্রশাসনের তরফ থেকেও এই মর্মে সাবধান করা হয়েছিল এবং একবার পুলিশ সিকিউরিটির বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু সেই পুলিশের সিকিউরিটি নিয়ে তাঁর নিদারুণ অভিজ্ঞতা হয়।

গত ১৮ ই অক্টোবর ২০২২, রাত্রি নটা নাগাদ যখন তিনি বাড়ি ফিরছিলেন তখন দুর থেকে মটর-সাইকেলে করে দুই দুষ্কৃতি তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। দুরত্ব বেশী হওয়ায় গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পথপার্শ্বস্থ একটি লোহার পোস্টে লাগে এবং বিকট শব্দ হয়। ঘটনার অব্যবহিত পরে তিনি স্থানীয় প্রশাসনকে টেলিফোনে তা জানান। পরের দিন থানায় গেলে তাকে বলা হয় "সেটা একটা পটকার আওয়াজ"। এবং তাকে প্রয়োজনে পুলিশি প্রহরা নিতে বলেন।পুলিশের প্রহরার নিদারুণ অভিজ্ঞতা মাথায় রেখে তিনি তা নিতে অস্বীকার করেন।

ঐ ঘটনার প্রতিবাদে গত ৬ ই নভেম্বর ২০২২, সাধারণ সম্পাদক সহ সম্পাদকমন্ডলীর একাধিক সদস্য এবং নিকটবর্তী নানা শাখার সদস্য/সদস্যদের উপস্থিতিতে যশোর রোড চাঁদপাড়া বাসস্ট্যান্ডে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এপিডিআর পক্ষ থেকে বিভিন্ন বক্তারা বক্তব্য রাখেন।এছাড়াও প্রয়াত বরুণ বিশ্বাসের দিদি প্রমিলা বিশ্বাস বক্তব্য রাখেন ।

তথ্যানুসন্ধান ৫

বারুইপুর জেলে চার বন্দীকে পিটিয়ে মারার ঘটনার তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট

গত আগস্ট (২০২২) মাসের প্রথম সপ্তাহে মাত্র তিনদিনের মধ্যে বারুইপুর জেলে চার জন বিচারাধীন বন্দীহত্যার ঘটনা একটা পোর্টাল সূত্রে সামনে আসে। মৃতরা হলেন - আব্দুল রাজ্জাক দেওয়ান (৩৪), জিয়াউল লস্কর (৩৬), আকবর খান (৪০) এবং সাইদুল মুন্সী (৩৪)।

এপিডিআর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে কয়েক দফায় তথ্যানুসন্ধান থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উঠে আসে।

আব্দুল রাজ্জাক দেওয়ান, বয়স- ৩৪, গ্রাম -কুড়ালি। তিনি পেশায় মুরগি ব্যবসায়ী। ব্যবসার কাজে বিহারে থাকতেন। গত ঈদুজ্জোহা উপলক্ষে গ্রামের বাড়িতে ফিরেছিলেন। গত ২৪/৭/২২ তারিখ, রবিবার সন্ধেবেলায় চার পাঁচজন সাদা পোশাকের (বারুইপুর থানার) পুলিশ এসে তাকে হঠাৎ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। রাজ্জাকের পরিবার এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাদের সম্পূর্ণ ধোঁয়াশায় রেখে 'ওপর থেকে চাপ আছে' বলে ওরা তাকে বাড়ি থেকে নিয়ে চলে যায়। পরের দিন তাকে বারুইপুর কোর্টে তোলা হলে, জানা যায় তার বিরুদ্ধে আইপিসি ৩৯৯, ৪০২ ধারায় মামলা দেওয়া হয়েছে। বিচারে তার ১৪ দিনের জেল কাস্টডি হয়। বুধবার (২৭/৭/২২) আব্দুলের স্ত্রী বারুইপুর জেলে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে, তিনি জানান যে তিনি সুস্থ আছেন। এরপর শনিবার (৩০/৭/২২) দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘুঁটিয়ারি ফাঁড়ির পুলিশ বাড়িতে গিয়ে পরিবারের লোকজনকে জানায় যে রেজ্জাক অসুস্থ, তাকে বারুইপুর হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। খবর পেয়ে বাড়ির লোকজন হসপিটালে গেলে দেখে যে সে মারা গেছে! মৃতদেহের গায়ে অজস্র কালশিটে দাগ। মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। হসপিটাল থেকে বলা হয়, শুক্রবার (৩১/৭/২২) রাতেই তিনি মারা গেছেন। মৃত্যুর কারণ পুলিশকে জিজ্ঞেস করলে, দুর্ব্যবহার করে তাদের বের করে দেওয়া হয়।

জিয়াউল লস্কর, বয়স ৩৬, গ্রাম - ঘুঁটিয়ারি (সুভাষপল্লী), পেশায় অটোচালক। বারুইপুর-ক্যানিং রুটে তিনি বহুদিন ভাড়ার অটো চালাতেন। গত ২৫/৭/২২ তারিখে বারুইপুর রাসমাঠের কাছে 'বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছি' বলে বিকেল সাড়ে চারটের দিকে বাড়ি থেকে বেরোন। অনেক রাত হয়ে গেলেও তিনি বাড়ি ফিরছিলেন না দেখে তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের লোকজন তাঁকে বারবার ফোন করে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু ফোনে তাঁকে ঐদিন পাওয়া যায়নি। পরদিন জিয়াউলের স্ত্রী থানায় গেলে জানতে পারেন, গতকাল (২৫/৭/২২) রাতে জিয়াউল সহ তার দুই বন্ধুকে 'বারুইপুরের বন্ধুর বাড়ি থেকে' বেধড়ক মারতে মারতে তুলে নিয়ে গেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। ২৬/৭/২২ বারুইপুর কোর্টে আনা হলে দেখা যায় তিনি খোঁড়াচ্ছিলেন। সন্দেহজনক ডাকাতির মামলা (সিআরপিসি ৩৯৯,৪০২) দেওয়া হয় তাদের। বিচারে ২৮ দিন জেল কাস্টডি হলে তাদের ঐদিন বারুইপুর জেলে

নিয়ে যাওয়া হয়। বুধবার (২৭/৭/২২) জিয়াউলের স্ত্রী বারুইপুর জেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি জানান যে তিনি সুস্থ আছেন, ভীষণ কান্নাকাটি করেন। এরপর ২৮/৭/২২ তারিখে জিয়াউল জেল থেকে গোপনে ফোন করে স্ত্রীকে ফোন পে এর মাধ্যমে তিন হাজার টাকা পাঠাতে বলে। তিনি বলেন, এই টাকা দিলে জেলে ভালো ভাবে থাকা যাবে, ভালো খাবার খাওয়া যাবে। তাঁর স্ত্রী সেদিনই দু'দফায় তাকে দু'হাজার টাকা পাঠান। তারপর থেকে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ আর হয়নি। ২/৮/২২, মঙ্গলবার ঘুঁটিয়ারি ফাঁড়ির পুলিশ এসে জানায়, 'গতপরশু জিয়াউল অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তাকে বারুইপুর সুপারস্পেশালিটি হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে সে গতকাল রাতে মারা যায়'। অথচ, জিয়াউলের এই অসুস্থতার কোনো খবরই পরিবারকে আগে জানানো হয়নি। পরিবারের লোকজন এরপর বারুইপুর হসপিটালে গিয়ে মৃতদেহ দেখতে চাইলে প্রথমে দেখতে দেবে না বলে নানান টালবাহানা করে। পরে দেখতে দিলে দেখা যায়, জিয়াউলের গায়েও অজস্র মারের কালশিটের দাগ। জিয়াউলের সঙ্গে একই মামলায় গ্রেফতার অন্য দু'জনের তিন দিন আগে জামিন হয়েছে। তাদের সূত্রে জানা গেছে, বুধবার (২৭/৭/২২) রাতে জিয়াউল অসুস্থ হয়ে পড়লে বৃহস্পতিবার তাকে জেল হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দু'দিন ধরে তার উপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়। বেডের সঙ্গে হাত পা বেঁধে প্রচণ্ড মেরে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে গায়ে গরম জল ঢেলে দেওয়া হয়। বারুইপুর থানায় বর্তমানে হাজিরা দিতে গেলে এই দুজনকে থানা থেকে নানান হুমকি দেওয়া হচ্ছে। জিয়াউলের পরিবার জিয়াউলকে জেলে পিটিয়ে মারা হয়েছে এই অভিযোগে কোর্টে মামলা দায়ের করেছে। যেখানে কোর্ট থেকে অর্ডার দেওয়া হয় পোস্টমর্টেম এর সময় তার পরিবারের দুজন সদস্য সেখানে উপস্থিত থাকতে পারবে। এবং গোটাটার ভিডিও রেকর্ডের দায়িত্বে থাকবেন ম্যাজিস্ট্রেট। যদিও পরিবার সূত্রের দাবি, এসব কিছুই করা হয়নি।

সাইদুল মুন্সী, বয়স ৩৪, গ্রাম –সন্তোষপুর। গত ২৫/৭/২২ তারিখে রাত বারোটায় মহেশতলা থানার পুলিশ সাইদুলের বাড়িতে এসে বলে, তাকে বড় বাবু থানায় দেখা করতে বলেছে। সাইদুলের স্ত্রী কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা জানায় যে, এমনি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তিনি সঙ্গে যেতে চাইলে তাকে যেতে দেওয়া হয়নি। পরদিন তার স্ত্রী কোন থানায় নিয়ে গেছে বুঝতে না পেরে প্রথমে জিঞ্জিরা বাজার পুলিশ ফাঁড়িতে খোঁজ করে, পরে মহেশতলা থানায় গিয়ে খোঁজ করে। প্রথমে কিছুতেই সাইদুলের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে পুলিশ ২০০ টাকা ঘুষ নিয়ে তাকে দেখতে দেয়। তার স্ত্রী দেখে সারারাত সাইদুলকে প্রচন্ড মারধর করা হয়েছে। এরপর তার স্ত্রী 'কেন মারছেন আপনারা ,কি করেছে ও?' একথা জিজ্ঞাসা করলে পুলিশ বলে ওর কাছে একটা ভোজালি পাওয়া গেছে। অথচ পরিবারের দাবি, বাড়ি থেকে শুধু সাইদুলকে ধরেছে পুলিশ , কোন অস্ত্র নিয়ে যায় নি সে। তারপর ওর স্ত্রীর সামনেই ওকে লাথি মারতে মারতে গাড়িতে তুলে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে যায়, তার পর বারুইপুর জেলে পাঠায়। পরদিন জেলে গিয়ে ওর স্ত্রী দেখা করে। থানা থেকে স্বতোপ্রনোদিত ভাবে এক উকিল দায়িত্ব নিয়েছিল। পরে ওর স্ত্রীও একজন উকিল ঠিক করে। একটু দেরি হয়ে যাওয়ার জন্য কারো সাথেই দেখা হয়নি তার। তবে উকিল জানায়, যে কেস দেওয়া হয়েছে তাতে ২৮ দিনের আগে জামিন পাওয়া সম্ভব নয়। নেক্সট কোর্ট ডেট ছিল ৮/৮/২২। তবে তার আগেই অসুস্থ হয়ে পড়ায় ১/৮/২২ তারিখে সাইদুলকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অথচ সেদিন পরিবারের লোকজনকে এবিষয়ে কোনো খবর দেওয়া হয়নি। ২/৮/২২ মঙ্গলবার পরিবারকে জানানো হলে পরিবার বারুইপুর হাসপাতালে গিয়ে দেখে, বিনা চিকিৎসায় হাসপাতালের বাথরুমে উলঙ্গ অবস্থায় মূত্রের উপর ফেলে রাখা হয়েছে সাইদুলকে। তার সারা পিঠে মারের দাগ। চিকিৎসার জন্য তারা বারবার অনুরোধ করলেও কোনো ফল মেলেনি। অবস্থা গুরুতর হলে ডাক্তার আইসিইউতে ভর্তি করতে বলেন, যদিও বারুইপুর হাসপাতালে আইসিইউ খালি ছিল না। পরিবার বেসরকারি হসপিটালে চিকিৎসার কথা বললে, পুলিশ তা খারিজ করে দেয়। কিছুক্ষণ পর তার মৃত্যু হয়।

আকবর খান - বয়স ৪০। গ্রাম - আমতলা (থানা-বিষ্ণুপুর)। পরিবার সূত্রে দাবি, গত দশ বারোদিন ধরে আকবর খান নিরুদ্দেশ ছিল। পুলিশ যে তাকে ধরে নিয়ে গেছে, সে ব্যাপারে পরিবারের কাউকেই কোনো খবর দেওয়া হয়নি। গত ২/৮/২২, মঙ্গলবার বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ বাড়িতে খবর দেয় যে, সে মারা গেছে। পরিবারের অভিযোগ, সারা শরীরে মারের দাগ। পরিবারের আরো অভিযোগ, মৃতদেহ আনতে গেলে পুলিশ জানায় টাকা দিলে তবেই মৃতদেহ পরিবারকে দেওয়া হবে।

এই চারটি বন্দীমৃত্যুর ঘটনাতে পর্যবেক্ষণঃ

১) এই চার বন্দীর মৃত্যু ঘটেছে ৩১/৭/২২ থেকে ২/৮/২২ এর মধ্যে।

২) মৃত বন্দীদের আলাদা আলাদা থানার পুলিশ তুলে নিয়ে গেলেও তাদের সবাইকেই সন্দেহজনক ডাকাতির মামলা (সিআরপিসি ৩৯৯,৪০২) দেওয়া হয়।

৩) বারুইপুর জেলে বুধবার (২৭/৭/২২) পরিবারের লোকজন দেখা করতে গেলে মৃত বন্দীরা সকলেই জানান, তারা সুস্থ আছেন।

৪) এরপর এরা অসুস্থ হয়ে পড়লেও বাড়ির লোকজনকে

সেইদিন কোনো খবর দেওয়া হয়নি। মৃত্যুর একদিন বা দু'দিন পরে গিয়ে পুলিশ বাড়িতে খবর দেয়।

৫) চারজনের মৃতদেহে-ই বীভৎস মারের কালশিটে দাগ।

৬) চারজন-ই কার্যত বিনা চিকিৎসায় মারা যায়।

দাবি

১) অবিলম্বে এই গোটা ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে (মাদক সেবনের অজুহাতে জেল হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনাকে লঘু করার প্রচেষ্টা বন্ধ করতে হবে)।

২) বারুইপুর জেলে বন্দিদের উপর লাগাতার চলা জেল কর্মী ও জেল পুলিশের অত্যাচার বন্ধ করতে হবে।

৩) থানা লকআপে পুলিশি জুলুম তথা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে।

৪) চার মৃত বন্দীদের পরিবারকে কমপক্ষে ২০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

শেষের কথা

উপরোক্ত দাবি এবং জেল-পুলিশ লকআপে বন্দীদের মানবাধিকার হরণের বিরুদ্ধে দঃ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে লাগাতার মিছিল, পথসভা করা হয়। পাশাপাশি বারুইপুর এসডিও, আইজি কারা ও কারামন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। গোটা ঘটনাকে বারুইপুর পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট এর ফেসবুক পেজ থেকে 'ফেক নিউজ' বলে প্রচার করে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালালেও অবশেষে আন্দোলনের চাপে সমস্ত ঘটনার কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে প্রশাসন। বাধ্য হয়েছে তড়িঘড়ি করে মিছিলের ঠিক পরদিন মহরমের ছুটির দিনেও মৃতদের পরিবারদের আলিপুর ডিএম অফিসে ডেকে পাঁচ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে।

তবে এখনো অবধি দোষীরা কেউ শাস্তি পাননি, গ্রেপ্তার ও হয় নি। যতদিন না এই চারটি বন্দিমৃত্যুর ঘটনার উপযুক্ত বিচারবিভাগীয় তদন্ত হচ্ছে এবং দোষীরা শাস্তি পাচ্ছে, ততদিন আন্দোলন চলবে।

এপিডিআর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটি।

সংগঠন সংবাদ

কৃষ্ণনগর শাখার সংগঠন সংবাদ :

পথসভা ও তথ্যানুসন্ধান :

কৃষ্ণনগর শহর সহ নদীয়া জেলার খাল, বিল ও নদীর ওপর বেআইনি নির্মান ও রাজনৈতিক প্রভাবদুষ্ট দখলদারির বিরুদ্ধে গত 24/09 একটি পথসভা হয় । এই পথসভায় বিশ্ব নদী দিবস এর ডাকে নদী বাঁচাও জীবন বাঁচাও মঞ্চের দেশব্যাপী নদী বাঁচাও অভিযানের সংহতিতে কৃষ্ণনগর শাখা , জলঙ্গী নদী সমাজ ও নদী বাঁচাও জীবন বাঁচাও এর পক্ষ থেকে একটি যৌথ পথসভা আহ্বায়িত হয়।নদী বাঁচাও অভিযানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই পথসভাকে সাফল্যমন্ডিত করতে এগিয়ে আসেন ছাত্র ও যুবরা । তারা তাদের গান ও ছবির সৃজনশীলতার মধ্যে দিয়ে শহরবাসীকে নদী বাঁচানোর আহ্বান ই রাখেন ।কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে যেভাবে দেশের জল জঙ্গল জমিকে উন্নয়নের নামে ধ্বংস করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে নিজের মতো করে গান বাঁধেন এই ছাত্র যুবরা যা এই পথসভাকে প্রাঞ্জল করে তোলে ।

প্রতিবাদ সভা :

গত 30 শে সেপ্টেম্বর সদর হসপিটাল মোড়ে পি এফ আই সহ নয়টি সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা আহ্বায়িত হয় ।এই প্রতিবাদ সভায় পি এফ আই সহ নয়টি সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি রাজ্যে এন আই এ এর ভূমিকা ও নিষিদ্ধকরনের রাজনীতির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখা হয় । নিষিদ্ধকরনের রাজনীতি প্রয়োগ করে বিরুদ্ধ মত তথা ভিন্নমতের অধিকারের ওপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয় । এই প্রতিবাদ সভায় ভাতৃপ্রতীম সংগঠন হিসেবে এ আই সি সি টি ইউ এর সদস্যরা তাদের সংহতি জানান ও প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত থাকেন। পার্শ্ববর্তী শাখা কমিটি নাকাশিপাড়া শাখা, নবদ্বীপ শাখা(প্রস্তুতি কমিটি) ও বাদকুল্লা-তাহেরপুর- বীরনগর শাখার সদস্যরাও উপস্থিত থাকেন ।

22 অক্টোবর চাকুরীপ্রার্থী আন্দোলনকারীদের ওপর মধ্যরাতে পুলিশী নির্যাতন চালিয়ে অনশন ভেঙে দেওয়ার প্রতিবাদে কৃষ্ণনগর শাখা প্রতিবাদ সভার ডাক দেয়। সরকারের বর্বরোচিত আক্রমণের বিরোধীতায় সমস্ত শহর বাসীকে এই প্রতিবাদ সভায় যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হয় এই সভা থেকে । পার্শ্ববর্তী শাখা নবদ্বীপ শাখা (প্রঃ কঃ) ও বীজপুর শাখার সদস্যরা এই পথসভায় উপস্থিত থাকেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল গভঃ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এই পথসভায় সংহতি জানান এবং এই সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন বিমল ব্রহ্ম ।

মুর্শিদাবাদ জেলার সংগঠন সংবাদ :গত ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ২০২২ জেলা ভাগের নামে দেশের মানচিত্র থেকে ঐতিহাসিক 'মুর্শিদাবাদ' কে মুছে দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি আরও অনেকগুলি সামাজিক সংগঠনকে সাথে নিয়ে বহরমপুরের সেন্টজন্স ব্রিগেড হলে

একটি গণ কনভেনশন করে।

ঐ দিনই (গত ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ২০২২) বিকাল ৪ টার সময় এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি ও বন্দিমুক্তি কমিটি, মুর্শিদাবাদ জেলা বহরমপুরের রণ নামক একটি নাট্য সংস্থার ঘরে PFI সহ আরও ৯টি সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে প্রেস রিলিজ সহ একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে।

গত ১৩ ই অক্টোবর, ২০২২ এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি বন্দিমুক্তি কমিটি, মুর্শিদাবাদ জেলা সহ আরও অনেকগুলি সামাজিক সংগঠনকে সাথে নিয়ে বহরমপুরের গোরাবাজার নিমতলার মোড়ে PFI সহ আরও ৯টি সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী সভা করে।

এপিডিআর বহরমপুর শাখার প্রতিবাদী মিছিল ও ডিএম কে গণ ডেপুটেশন

১। জেলা ভাগের নামে দেশের মানচিত্র থেকে ঐতিহাসিক 'মুর্শিদাবাদ' কে মুছে দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে

২। নদীয়ার বাগদা সীমান্তে ধষণকারী BSF এর শাস্তির দাবিতে ও জনপদ ছেড়ে BSF কে নিদিষ্ট সীমান্ত এলাকায় ফিরে যাওয়ার দাবিতে

৩। ফারাক্কা সহ জেলার নানা প্রান্তে সাধারন জনগণের ওপর নিপীড়নকারী পুলিশের অবিলম্বে শাস্তির দাবিতে

৩। পুলিশ ও জেল হেফাজতে অত্যাচার ও হত্যার সাথে যুক্ত পুলিশ অফিসারদের শাস্তির দাবিতে

গত ২ রা সেপ্টেম্বর, ২০২২ এপিডিআর বহরমপুর শাখা উক্ত দাবিতে মুর্শিদাবাদ জেলা শাসককে একটি মিছিল সহযোগে গণ ডেপুটেশন দেয়।

এপিডিআর বহরমপুর শাখার প্রতিবাদী সভা

গত ২১ শে অক্টোবর, ২০২২ এপিডিআর বহরমপুর শাখা গোরাবাজার নিমতলার মোড়ে গভীর রাতে অনশনরত চাকরীপ্রার্থীর আন্দোলনের ওপর পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একটি সভা করে।

এপিডিআর ডোমকল শাখার পথসভা।

সীমান্ত এলাকা থেকে বিএসএফ কে ৫০ কিমি এলাকা পর্যন্ত ক্ষমতা প্রদান এর বিরুদ্ধে এবং সীমান্ত এলাকায় সাধারণ চাষিদের উপর বিএসএফ এর নির্যাতনের বিরুদ্ধে, মুর্শিদাবাদ জেলাকে তিন ভাগ করে মুর্শিদাবাদ নামটি মুছে দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে, ফরাক্কাতে জোর করে শতাধিক বিঘা আমবাগান কেটে ও কৃষি জমি দখল করে হাই টেনশন বিদ্যুৎ লাইন করার প্রতিবাদে গত ১২ আগষ্ট ডোমকল ব্রীজ মোড়ে এপিডিআর ডোমকল শাখার উদ্যোগে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। পথসভাটি ছিল কর্মী বাহিনী ও এলাকার মানুষের আন্তরিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা ও পুলিশী বেষ্টনী ছিল চোখে পড়ার মতো।

হুগলী জেলা কমিটি ও শাখাগুলির কার্যাবলীর প্রতিবেদন

১১/০৯/২২ শ্রীরামপুর শাখা আয়োজিত 'যতীন লাহিড়ী স্মারক বক্তৃতা' (বক্তা- কণিষ্ক চৌধুরী/ সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বিষয়- লক্ষ্য হিন্দু রাষ্ট্র: ইতিহাসের বিকৃতি) উপস্থিতি- ৫৫

১৫/০৯/২২ বারুইপুর জেলে চার ব্যাক্তির হত্যা/ বিলকিস বানুর ধর্ষক ও গণহত্যাকারীদের মুক্তির বিরুদ্ধে/ তিস্তা সেতলাবাদের উপর মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে/ আনিস খানের ভাই-এর উপর প্রাণঘাতী হামলার প্রতিবাদে/ সমস্ত রাজবন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে চুঁচুড়ায় জেলা কমিটির পথসভা

১০/১০/২২ PFI সহ ৯টি সংগঠন নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে এবং ২৯/০৯/২২ তারিখে রাজাবাজার ও মৌলালিতে এপিডিআর সহ অন্যান্য সংগঠনের সভা করতে না দিয়ে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে শ্রীরামপুরে জেলা কমিটির পথসভা

২২/১০/২২ করুণাময়ীতে অনশন রত আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশী সন্ত্রাসের প্রতিবাদে চুঁচুড়া শাখার পথসভা

২২/১০/২২ করুণাময়ীতে অনশনরত আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশী সন্ত্রাসের প্রতিবাদে শ্রীরামপুর শাখার দুটি পথসভা (রিষড়া বাঁশতলা/ রিষড়া সেবাসদন)

২৩/১০/২২ করুণাময়ীতে অনশরত আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশী সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ত্রিবেনী- বাঁশবেড়িয়া শাখার পথসভা

২৫/১০/২২ করুণাময়ীতে অনশনরত আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশী সন্ত্রাসের প্রতিবাদে চন্দননগর শাখার পথসভা

২০/১১/২২ হুগলী জেলা কমিটির উদ্যোগে চন্দননগরে আলোচনা সভা। বিষয়ঃ গণতান্ত্রিক অধিকার ও ভারতের বিচার ব্যবস্থা বক্তা- জগৎজ্যোতি রায়চৌধুরী, অভিজিৎ দত্ত। (উপস্থিতি ৫৬)

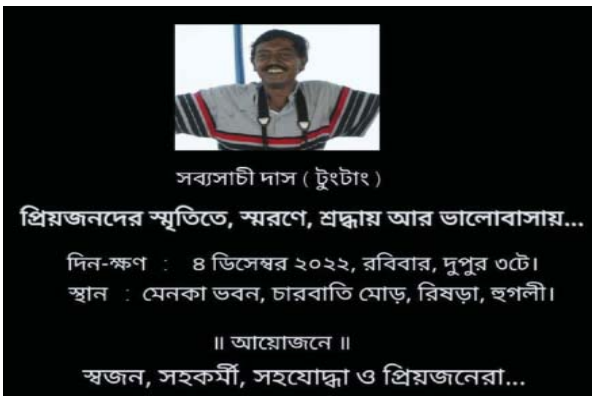

নিষিদ্ধকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধে গণ-কনভেনশন

১০/১১/২০২২ তারিখে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির উদ্যোগে কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে নিষিদ্ধকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধে এক গণকনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছিল। এই কনভেনশনে বিভিন্ন সংগঠন ও নাগরিক সমাজের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছিলেন। গণকনভেনশনের খসড়া প্রস্তাব পাঠ করেন এ পিডিআরের সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত সুর। খসড়া প্রস্তাবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল -কেন্দ্র সরকার সম্প্রতি পি এফ আই সহ নটি সংগঠন কে নিষিদ্ধ করেছে। এছাড়া আমাদের দেশে আরো বহু সংগঠন যেমন ছাত্র সংগঠন সিমি, সিপিআই (মাওবাদী) ও তাদের প্রভাবিত গণ সংগঠন, ক্যাম্পাস ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রভৃতি নিষিদ্ধ রয়েছে । ভারতের মতো বৃহত্তর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ইউ এ পি এ আইনের মত দানবীয় আইন ব্যবহার করে ভিন্ন মত ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে ।

টেট উত্তীর্ণ ন্যায্য চাকুরির দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর পুলিশ বর্বরোচিত আক্রমণের নিন্দা করে একটি প্রস্তাব পাঠ করেন এপিডিয়ারের সহকারী সম্পাদক মৌতুলী নাগ।

প্রতিবেদনের ওপর বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। নাগরিক সমন্বয় মঞ্চের পক্ষ থেকে অ্যাডভোকেট আনিসুর রহমান বলেন যে, বিজেপি গণতন্ত্র ও সংবিধান মানে না। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে দমন করার জন্যই বিভিন্ন সংগঠনকে নিষিদ্ধ করেছে। বিভাজনের রাজনীতির উদ্দেশ্যেই নিষিদ্ধকরণের রাজনীতি করছে বিজেপি।

বীরভূম জীবন জীবিকা প্রকৃতি বাঁচাও মহাসভার প্রতিনিধির বক্তব্য ছিল, ডেউচা পাঁচামি খনি প্রকল্পের বিরোধিতা করার জন্য গ্রামগুলি দুরবস্থার মধ্যে রয়েছে। জমি ছাড়বেন না এমন ব হু সংখ্যক মানুষ আছেন খনি প্রকল্প এলাকায়। তারা জোর করে জমি ছাড়তে কাউকে বাধ্য করবেন না। এছাড়াও তারা চান সাঁওতাল মহিলাদের উপর অত্যাচার বন্ধ হোক। গণঅধিকার মঞ্চের পক্ষে ডঃ সুরেশ বাইনের বক্তব্য ছিল যে, দেশের জল জঙ্গল জমি কর্পোটের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। নাগরিকত্ব আইন চালু করার জন্য মানুষের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে মানুষের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে।

'অধিকার' সংগঠনের পক্ষে নাতাশার বক্তব্য হল যে, রাষ্ট্র পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। নিষিদ্ধকরণের রাজনীতিকে সমর্থন করা মানে রাষ্ট্রকে অধিক ক্ষমতাশালী করা।

মোঃ শাহাবুদ্দিন বলেন যে, দিল্লি ট্রাইব্যুনালের বিচারক গীতা মিত্তাল রায় দেন, সিমিকে নিষিদ্ধ করার কোন কারণ নেই। সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে সিমি কে নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু বাস্তবে সেই রায় কার্যকরী করা হয়নি।

এন,আর,সি মঞ্চের পক্ষে তাইজুল ইসলাম বলেন, জনসংখ্যার এক শতাংশ মানুষ সমস্ত রকমের শাসন -শোষণ চালিয়ে যাবে। শোষণের অংশ হচ্ছে নিষিদ্ধকরণের রাজনীতি। এর বিরুদ্ধে সমস্ত ক্ষেত্রে দাঁড়াতে হবে । এরাই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের শত্রু, এটা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ উপলব্ধি করতে পারেনি।

গণ প্রতিরোধ মঞ্চের তরফে মধুসূদন বলেন - ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার মধ্য দিয়ে অধিকার ও নিষিদ্ধকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে।আজাদ মোর্চার পক্ষে প্রসুন চ্যাটার্জী বলেন যে, বামফ্রন্টের জমানাতে নিষিদ্ধ করনের রাজনীতি চালু হয়। বিশেষ করে বুদ্ধদেবের সরকারের সময়ে অধিকার হরণ বেশি হয়। বামফ্রন্ট ও তৃণমূল উভয় সরকারের সময় মাওবাদী বন্দী স্বপন দাশগুপ্ত ও সুদীপ চোংদার জেলে যথাযথ চিকিৎসার সুবিধা না পাওয়ার জন্য মারা যান। ঘোষণা করে নিষিদ্ধ করা আর ঘোষণা না করে নিষিদ্ধ করার মতো আচরণ একই ব্যাপার।

বিভিন্ন নাগরিক ও সামাজিক সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিষিদ্ধকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর উপস্থিত সমস্ত বক্তারা জোর দেন।

পাঠকের পাতা

সম্পাদক সমীপেষু

পত্রিকা উপসমিতি, "অধিকার", কলকাতা।

মহাশয়,

"অধিকার" পত্রিকার আগস্ট ২০২২ সংখ্যায় শুভ্র মল্লিকের লেখা "জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ আসলে সুকুমার রায়ের খুড়োর কল" নিবন্ধটিতে লেখা হয়েছে – "বরাবর ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দি বলয় থেকে নিয়মিত প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার ফলে হিন্দি আধিপত্যবাদ কায়েমের দুরবিসন্ধি স্পষ্ট রুপে প্রতিভাত হয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রশ্নে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।" কিন্তু আমরা দেখেছি, প্রধানমন্ত্রী হিন্দি বলয়ের হন বা অহিন্দি বলয়ের, এদেশের শিক্ষানীতি হোক ভাষানীতি, সমস্ত নীতিরই অন্যতম লক্ষ্য থাকে বাংলা-সহ সমস্ত অহিন্দি ভাষার প্রসার ও ব্যবহারকে ব্যাহত করে হিন্দি ভাষার আধিপত্য কায়েম করা। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জন্মসূত্রে হিন্দিভাষী না হলেও, বাংলা-সহ অন্যান্য অহিন্দি ভাষার উপর অবাধে চলছে হিন্দি-ভাষার আধিপত্যবাদের বুলডোজার। রাষ্ট্রীয় মদতে কোনো ভাষিক আধিপত্যবাদের বিষয়টি অবশ্যই একটি মানবাধিকারের প্রশ্ন, কারণ আমার মাতৃভাষায় শিক্ষা ও সমস্ত সরকারী পরিষেবা পাওয়ার অধিকার আমার অন্যতম মৌলিক অধিকার। আলোচ্য নিবন্ধটিতে "ভাষা সমস্যা" শীর্ষক একটি অনুচ্ছেদ থাকলেও বিষয়টির গুরুত্ববিচার করে আরও কিছু বক্তব্য এই পত্রের মাধ্যমে তুলে ধরতে চাইছি।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-র ভাষাশিক্ষা বিষয়ক বক্তব্যেকে খুব তথ্যনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া শিক্ষানীতির অপর একটি লক্ষ্য হল শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দি ভাষার আধিপত্য কায়েম করা, যা বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর"হিন্দি-হিন্দু হিন্দুস্তান" নির্মাণপ্রকল্পের অন্যতম অঙ্গ। ২০১৯ সালে প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়ায় হিন্দিভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। তখন বিভিন্ন অহিন্দিভাষী রাজ্যের প্রবল প্রতিবাদের সন্মুখীন হয়ে সরকার ঘুরপথে হিন্দি চাপানোর কৌশল নেয়। চূড়ান্ত নীতিটিতে অষ্টম শ্রেণী অবধি মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা বলা হলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে কোথাও কোনও সমস্যা হলে হিন্দিকে মাধ্যম হিসেবে বেছে নেওয়া যাবে। অতএব, দেশের সমস্ত প্রান্তের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিন্দি পড়ানোর ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক। সেইসঙ্গে ত্রি-ভাষা নীতি অনুসরণ করে শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দির আগ্রাসনকে সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। এযাবৎ ত্রি-ভাষা তত্ত্ব অবশ্যপাঠ্য হিসেবে না থাকা সত্ত্বেও যখন দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বেশিরভাগ রাজ্যে হিন্দি পড়ানোই দস্তুর ছিল, ত্রি-ভাষা নীতি প্রযুক্ত হলে কি হবে তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। যেমন, যাদের মাতৃভাষা বাংলা তারা কজনইবা তৃতীয় ভাষা রূপে সাঁওতালি, নেপালি, অহমীয়া বা তামিল ভাষাকে নির্বাচন করবে? হিন্দিভাষা ও সংস্কৃতির আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী প্রভাবের কারণে সকল শিক্ষার্থীর তৃতীয় ভাষা হবে হিন্দি। এই নীতি বলছে দেশের ৫৪ শতাংশ মানুষ নাকি হিন্দিভাষী! হবেই তো! ভারতের ভাষানীতিই তো বলছে, 'ভারতের যে কোনও রাজ্যে যদি আপনি হিন্দিকে বাদ দিয়ে ১৭২৭টি ভাষার মধ্যে যে কোনও একটি ভাষা বলতে বা বুঝতে পারেন, তা হলেই আপনি "হিন্দি দ্বিভাষিক"'। এই ভাবেই দেশে হিন্দিভাষা জানে এমন মানুষের সংখ্যা ১৯৭১ সালের ৩৬.৯৯% থেকে ক্রমশ বাড়তে বাড়তে ২০১১-য় ৪৩.৬৩%-এ এসে পৌঁছেছিল। আর আজ এভাবেই সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে "ভারতে শতকরা ৫৪ ভাগ মানুষ হিন্দি বলতে বুঝতে পারেন'', কথাটা সাংবিধানিক তকমা পেয়ে গেল। অন্য দিকে হিন্দি মাতৃভাষার ২৬.৬১ শতাংশ বাদ দিলে বাকি ৭৩.৩৯ শতাংশ ভারতীয় তাঁদের মাতৃভাষার গুরুত্ব হারিয়ে ফেললেন। কিভাবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দি আধিপত্যবাদ দেশের সমস্ত ভাষা ও সংস্কৃতি কে গ্রাস করেছে তা এই তথ্য থেকে বোঝা যায়, ভারত সরকার কেবল হিন্দির বিস্তারের জন্য যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে, তা কেবলমাত্র হিন্দি মাতৃভাষাভাষীদের জন্যই, বাকি ১৭২৭টি মাতৃভাষার বিস্তার বা উন্নতির জন্য নয় । অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ভাষার জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে খুব সামান্য টাকা বরাদ্দ থাকে বা থাকেই না । কোনও কোনও রাজ্যের সরকারি ভাষার মর্যাদা পেলেও জাতীয় স্তরে এই ভাষাগুলির কোনও রকম স্বীকৃতি নেই। ১৯৯১ সাল থেকে ভাষাবিদেরা ১০,০০০ জনের কম বক্তা থাকলে সেই মাতৃভাষাটিকে 'অন্যান্য ভাষা'র অন্তর্গত করে বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার নিদান দিয়েছেন। কোনোদিন হয়তো প্রকৃত বাংলাভাষীর সংখ্যা ১০০০০ এর নীচে কমে গিয়ে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষা বাংলাভাষাও রাষ্ট্রীয় নিয়মে "অন্যান্য ভাষা" হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে মনে পরে যাচ্ছে গতবছর ১৩/০৭/২০১৯ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিতসম্পাদকীয় "ভাষা রাজনীতি"র কথা, যেখানে সঠিকভাবেই লেখা হয়েছিল "প্রশ্নটি নিতান্তই আধিপত্যের। দেশের শাসকরা ভুলাইয়া দিতে ব্যাকুল যে হিন্দি ভারতের জাতীয় ভাষা বা 'রাষ্ট্রভাষা' নহে । তাঁহারা গণচেতনা হইতে এই কথাটি মুছিয়া দিতে চাহেন যে ভারতে কোনও একক রাষ্ট্রভাষা নাই— কেন্দ্রীয় সরকারের কাজে ইংরাজি ও হিন্দির গ্রহণযোগ্যতা সমান।" শাসকের এই দুষ্টচিন্তার কারণ সম্পর্কে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক অম্লান দত্ত ১৯৫৮ সালের ২৬ জানুয়ারী আনন্দবাজার পত্রিকায় "মাতৃভাষা, ইংরেজি ও হিন্দি" প্রবন্ধে লিখেছিলেন "হিন্দি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হলে রাষ্ট্রযন্ত্রের

উপর হিন্দিভাষীদের কর্তৃত্ব স্থাপন অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। এই আশঙ্কা বিশেষভাবে প্রবল এই কারণে যে, হিন্দিভাষীরা ইতিমধ্যেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী। এই বিশেষ গোষ্ঠীর ভাষাই যদি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয় তবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক জীবনের উপর এদের আধিপত্য অপ্রতিরোধ্য হবে।" প্রসঙ্গত, ১৯৬৮ সালের প্রথম জাতীয় শিক্ষানীতিতেও সরাসরি হিন্দিভাষার গুরুত্ব বাড়ানোর প্রস্তাব আনা হয়েছিল। সংযুক্তিকরণের মাধ্যম হিসেবে হিন্দিকে এমনভাবে উন্নীত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল যাতে তা, সংবিধানের ৩৫১ তম ধারা অনুযায়ী, ভারতের সর্বাঙ্গীণ ও ঐক্যবদ্ধ সংস্কৃতি চর্চা ও প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম হয়ে ওঠে। ঐ সময়েও ভারতের অহিন্দিভাষী রাজ্যগুলিকে তৃতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দি পড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এদেশে শাসক বদল হলেও তার আগ্রাসী মনোবৃত্তি পরিবর্তিত হয়না। তাই সেই ১৯৬৮ সালের প্রথম শিক্ষানীতির ধারাবাহিকতা বহনকারী এই ২০২০ সালের নয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি অম্লানবাবুর সেই আশঙ্কা কেই আজ সত্যি করতে চলেছে। "এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত" শ্লোগানের আড়ালে এই নীতি দেশের ভাষাবৈচিত্র্য ধ্বংস করে স্বৈরাচারী "হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান" নীতিকেই প্রয়োগ করতে চাইবে। "হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থানের" প্রতিনিধিরা হিন্দিভাষার একাধিপত্য কায়েম করতে সাংবাধানিক স্বীকৃত না থাকলেও হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা বলে চালিয়ে দিচ্ছে। ব্যাঙ্ক, রেল সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় দপ্তরে দেখা যায় লেখা আছে "হিন্দি হী রাষ্ট্রভাষা হামারা/য় হী হিন্দ কী রাণী হ্যায়।" এটি একটি আদ্যন্ত রাষ্ট্রীয় মিথ্যাচার। সংবিধানে ভারতীয় ভাষা প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে ১৭তম খন্ডে, যেখানে "Official Language" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে "দেবনাগরী লেখা হিন্দি"-র। ভারত সরকারের ভাষা-বাজেটের প্রায় সবটুকুই ব্যর করা হয় এই হিন্দি ভাষার উন্নতির জন্য যার কোনো সাংবিধানিক মান্যতা নেই, নির্দেশ নেই হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা বলারও। ১৩/১০/২০১৩ তে গুজরাত হাইকোর্ট এক রায়ে জানান "Many people speak Hindi and write in Devnagri script but there is nothing on the record to suggest that any provision has been made or order issued declaring Hindi as a National Language of the country" অথচ, "রাষ্ট্রভাষা"র মিথ্যা ঢক্কানিনাদে অন্যান্য অহিন্দি ভাষা সহ বাংলাভাষার উপর সমানে চলছে "হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থানের" বুলডোজার। সুচতুর ভাবে ভাষার সাথে সংখ্যাগুরু ধর্মকেও সমার্থক করে দেওয়া হচ্ছে। অথচ আসাম অঙ্গরাজ্যের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা বলছে, "হিন্দুরাষ্ট্র" নয়, ভারত আসলে হবে "হিন্দি রাষ্ট্র"। কিন্তু, হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লাগাতে পোশাকি নাম দেওয়া হবে "হিন্দুরাষ্ট্র"। তারপর হিন্দু বাঙালি থাকবে ডিটেনশান ক্যাম্পে। অহিন্দু বাঙালিদেরও একই পরিণতি হবে। একইভাবে বাংলার বুকে প্রতিষ্ঠা হয়, হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয় আর ঝাড়খণ্ড, বিহার, ছত্তিসগড় ও আসামে বাংলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলি একের পর এক বন্ধ হয়ে উঠে যেতে থাকে।

লক্ষণীয় যে আলোচ্য জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ তে ভারতীয় "ধ্রুপদী" ভাষা সম্পর্কে বলা হচ্ছে "India also has an extremely rich literature in other classical languages, including classical Tamil, as well as classical Telugu, Kannada, Malayalam, and Odia, in addition to Pali, Persian, and Prakrit; these classical languages and their literatures too must be preserved for their richness and for the pleasure and enrichment of posterity." না এই তালিকায় বাংলা নেই, বাংলা নাকি ধ্রুপদী ভাষা নয়! অথচ, এই বাংলা হরফেই সংস্কৃত লেখা হত। বিদ্যাসাগর মশাই বাংলা হরফেই ব্যকরণ কৌমুদী লিখেছিলেন। সেই বাংলাকে সরিয়ে সংস্কৃতে আনা হয়েছে দেড়শ বছর আগে ফোর্ট উইলিয়ামে তৈরি হিন্দুস্থানি হরফ। আর আলোচ্য সাম্প্রতিক শিক্ষানীতিতে সংস্কৃত ভাষাশিক্ষায় যতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, পালি বা তামিলের মত প্রাচীন ভারতীয় ভাষাগুলিকে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধ সাহিত্য, তামিল ভাষায় থিরুভাল্লুভারএর মতাদর্শ ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঐতিহ্য বহন করে, তাই হয়তো বাদ গেল। কেবলমাত্র মনুবাদী ঐতিহ্যের ইতিহাসকে তুলে ধরে ভুলিয়ে দেওয়া হবে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বিভিন্ন দার্শনিক অবস্থানের দ্বন্দ্ব আর সংঘাতের সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে। সেইসঙ্গে, বাংলা সহ সমস্ত অহিন্দি ভাষাকেই দেশের ভাষামানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েই এই নয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

"অধিকার" পত্রিকার নিয়মিত পাঠক হিসেবে নিজের সংক্ষিপ্ত মতামত তুলে ধরলাম।

ইতি

অজেয় পাঠক

ঠিকানা - গ্রাম - হরিণডাঙ্গা, থানা+পো - ডায়মন্ড হারবার, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা